

প্রথম সংস্করণ
মার্চ, ১৯৫৮
প্রকাশক
শ্রীনিরঞ্জন বসু
গণসাহিত্য ভবন
১৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীঅমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রাকর
শ্রীনিত্যগোপাল চৌধুরী
জয়হিন্দ প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৪২ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৯
বাঁধাই
এম. এ রহিম এণ্ড কোং
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৯

যুগপুরুষ গুরজাড়া আপ্পারাও স্মরণে

॥ ভূমিকা ॥

'আধুনিক ভারতের গল্পসঞ্চয়ন' ও 'কেরালার গল্পগুচ্ছ'র দ্রুত সংস্করণান্তরের ফলে প্রাদেশিক সাহিত্য যে পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করে তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হ'ল।

এখন প্রকাশিত হচ্ছে আমার মাতৃভাষা থেকে অনূদিত গল্পের সঞ্চয়ন— 'অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ'।

অন্ধ্র বা তেলেগু সাহিত্যের ছোটগল্প বর্তমানে আগের তুলনায় আরো বাস্তবমুখী ও জীবনধর্মী। বর্তমান লেখকরা অতীতের গতানুগতিকতা বর্জন করে সাধারণ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাকে সাহিত্যের উপজীব্য করে মাধুর্য বৃদ্ধি করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বছর ছয়েক আগে পালাগুম্মি পদ্মরাজু রচিত 'গালিওয়ানা' (ঝড়) নামক ছোটগল্প আন্তর্জাতিক ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, এই গ্রন্থে উক্ত গল্পও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আশা করি, এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পসমূহের মূল সুর থেকে সপ্রমাণ হবে যে ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের অন্তরের ঐক্য কত গভীর আর নিবিড়।

এই মুহূর্তে সংকলিত গল্পসমূহের লেখক এবং স্থানীয় ভাবে সাহায্যকারী ধনপতি বসু, শ্রীঅজিত কুমার কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ, সাধন সরকার, গণেশ সাও, চিত্ত মিত্র ও অণু দাসের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি। এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীনিরঞ্জন বসু মহাশয়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রাদেশিক সংস্কৃতির বিনিময় ঘটানোর এই প্রয়াসের জন্য পত্রপত্রিকা ও পাঠক মহলের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার আশা পোষণ করে বক্তব্য শেষ করছি।

॥ গল্পসূচী ॥

ঝড়

(আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

গোধূলি বেলা। নদীকূল। বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায় কার নীরব নির্দেশে যেন সন্ধ্যা আঁধারের মন্ত্র পড়ে। একটি নৌকো আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। নৌকোর দুই দিকে কুলু কুলু ধ্বনি। যতদূর দৃষ্টি যায় ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত সমাহিত ভাব। কোথাও জীবনের কোন কোলাহল নেই। আছে শুধু একটা অনুভূতি। মৃত্যুস্পর্শের সে অনুভূতি যেন মনে গিয়ে প্রকম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, জীবন সায়াহ্নের একটি উদাসীনতা পূর্ণ রূপ নিয়ে শান্ত-নৈরাশ্যে ঘেরা মনকে ছেয়ে ফেলেছে। অদূরের স্পষ্ট আলোকে দেখা দেওয়া সামনের গাছগুলো তাদের মায়াজাল প্রসারিত করে যেন নৌকোটিকে আকর্ষণ করছে। আর পেছিয়ে পড়া গাছগুলো যেন তাদের ছায়াকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করে দিয়েছে ভৌতিক অন্ধকারের সঙ্গে। নৌকোর দোদুল-দোলায় নদীর কূল যেন উঁচু-নিচু দেখাচ্ছে। আমি মনোজলের গভীরতার পরিমাপ করতে ব্যস্ত। মহাশূণ্যের অসীম অন্ধকারের বুক চিরে আঁধার রাতের তারারা যেমন মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে ওঠে, তেমনি আমার মানসচোখ মাঝে মাঝে প্রদীপ্ত হয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের অসীমতায়।

এখন হাওয়া কমে গেছে। নৌকোর পেছন দিকে থাকা উনুনে আগুন জ্বলছে। কখনও তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, আবার কখনো স্তিমিত হয়ে আসে। একজন মাল্লা নৌকোর জমা জল সেঁচে বের করে দিচ্ছে। হরেক রকম পণ্যে বোঝাই বস্তার আধার এ নাও। ধান, গুড়, নুন, তেঁতুল ইত্যাদি। আমি নৌকোর ছাদে বসে আছি। নৌকোর ভেতর থেকে ভুর ভুর করে

আসছে চুরুটের ধোঁয়া। আর ছড়িয়ে পড়ছে কথোপকথনের আওয়াজ। মহাজনের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। নৌকো অগ্রসর হচ্ছে।

তীর থেকে কে যেন হাঁক দেয়, "ও: মাঝি! নৌকোটাকে একটু এই ধারে নিয়ে এস না। ঠিক এই দিকে।"

তীরে লাগাতেই দু'জন তাতে উঠে পড়ে। তাদের ওঠার ফলে নৌকো সেদিকে একটু ঝুঁকে যায়।

"ছাদে বসবো।"—এক নারী কণ্ঠের আবেদন।

"এতদিন কোথায় ছিলি। দেখা দিসনি তো।" হাল ধরে থাকা মাঝি জিজ্ঞেস করে।

"স্বামীর সঙ্গে বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তম্ বেড়াতে গেছিলাম।"

"এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

"মণ্ডপাক যাচ্ছি ভাই। তুমি ভাল আছ তো? সেই মহাজনই আছে নাকি?"

"হ্যাঁ"।

ওর সঙ্গে থাকা পুরুষ লোকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছাদে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বোধ হয় ঘুমের আমেজে তার মুখ থেকে চুরুট পড়ে গেল। তরুণী সেটা নিভিয়ে রেখে দেয়।

"শুনছ! উঠে বসনা।"

"চুপ কর শয়তান মাগী। তুই কি ভেবেছিস আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। শয়তানী করলে ঘাড় ধরে জলে চুবিয়ে মারবো।

যথারীতি পাশ ফিরে শুয়ে থাকে লোকটি। মেয়েটি আধ নেংটা সেই লোকটির গা আঁচল দিয়ে ঢেকে দেয়। চুরুটটি বের করে ধরায়। দেশলাইয়ের একঝলক আলোতে আমি তরুণীর মুখ দেখে নিই।—শ্যাম বর্ণ।

তার কণ্ঠস্বরে মিশ্রিত আছে পুরুষের কণ্ঠস্বর। তার কথা শুনে মনে হয় যেন সে অত্যন্ত পরিচিত। বাহুস্পর্শে যেন নিজের মনে টানছে লোককে। মুখটি তত সুন্দর নয়, কিছুটা তোবড়ানো গোছের যেন। কিন্তু তবুও তার চেহারায় আছে একটি ভাল মানুষের ছাপ। সেই অন্ধকারেও জল জল করতে থাকে তার চোখ—অক্ষ

সমস্ত সত্তা আর পারিপার্শ্বিকের উপর জাগ্রত পাহারা। সেই দেশালাইয়ের কাঠির আলোতে সে পাশে শুয়ে থাকা আমাকেও দেখে নিল বোধ হয়।

"শুনছো!—এখানে অন্যলোক শুয়ে আছে।" বলে সে নিজের স্বামীকে জাগাতে থাকে।

"শুয়ে পড়,—চিল্লাচিল্লি করলে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব!" কর্কশ স্বরে উত্তর দেয় লোকটা এবং অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর একটু সরেও যায় বোধ করি।

ইতিমধ্যে মহাজন প্রদীপ ধরে নৌকোর একপাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে,—"এই রাঙ্গী, তোর সঙ্গে ঐ লোকটি কে?"

"বাবু, এ পাড়াল। আমার স্বামী"—রাঙ্গী উত্তর দেয়।

"পাড়াল? নাবা ওকে। বেটাচ্ছেলে চোর। তোর কি একটুও আক্কেল নেই। আবার সেই বদমাস লোকটাকে নৌকোতে তুললি। বজ্জাৎটা এক নম্বরের মদখোর!"

"আমি একটুও খাইনি, কে বলছে আমি মদ খেয়েছি?"

"আরে—ওকে নাবা। কে ওকে নৌকোয় চড়তে দিয়েছে। এই পাঁড় মাতালটাকে নাবা।"

"পাঁড় মাতাল নই। একটু-আধটু খাই।"

"আরে চুপ কর না।—বাবুজি আমরা এই মণ্ডপাকের কাছে নেবে যাব।" রাঙ্গী উত্তর দেয়।

"মহাজন মশায়, নমস্কার। সবি আপনার দয়া, আজকে আমি মোটেই মদ খাইনি, বিশ্বাস করুন—বিশ্বাস করুন বাবু।" জোর গলায় পাড়াল বলে।

"মাতলামি করলে নদীতে ছুঁড়ে ফেল দোব, সাবধান বলে দিচ্ছি।" মহাজন এই কথা বলে ভেতরে ঢুকে যায়।

পাড়াল উঠে বসে। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে মাতালের মত দেখাচ্ছিল না।

"নদীতে ছুঁড়ে ফেলবে। শালা শুয়োরের বাচ্চা।" পাড়াল ধীরে বলে।

"আরে, চুপ কর না। শুনতে পাবে যে।"

"শালা, সকালেই দেখতে পাবে নৌকার অবস্থাটা, আমার কাছে এসেছে ডাঁট দেখাতে।"

"চুপ কর না। ওদিকে কেউ শুয়ে আছে।"

"কে ?......কে শুয়ে আছে এখানে।" কথাটা বলেই পাড়াল চুরুট ধরায়। পাড়ালের গোঁফ বড়, চেহারা লম্বা, ছাতিটা চওড়া পাথরের চ্যাঙাড়ের মত শক্ত আর উঁচু। কাঁধে হাড়গুলো যেন ধনুকের মত বেঁকে আছে। সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে গেলে লোকটি তত মোটা নয়। বরং রোগাই বলা চলে তবে চেহারার কাঠামোটা খুব মজবুত।

নৌকো নিস্তব্ধতার বুক চিরে অগ্রসর হচ্ছে। পিছনের দিকে থাকা উনুন এখন আর জ্বলছে না, মাঝি-মাল্লারা থালা-বাসন নিয়ে সব খেতে বসেছে।

হাওয়া তত ঠাণ্ডা না হলেও গায়ে গামছা মুড়ি দিতে হয়েছে। সেই গভীর অন্ধকারময় অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে নিজের শরীরটাকে খুলে রাখতে আমার ভয় করছিল। হাওয়ার গতিতে যেন নারীর স্পর্শানুভূতি ও উগ্রপৌরুষের আতর ছড়িয়ে রয়েছে নায়ে। নৌকো যেন জলের গায়ে নরম হাতের মৃদু প্রলেপ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অবর্ণনীয় মাধুর্যে সে রাত্রি যেন অভিসারিকার ভয়-স্পন্দিত হৃদয়বৃন্তের পুষ্পোদক। সেই পরিবেশের মধ্যে আমার মনে ঝঙ্কার তুলেছিল কেবলমাত্র দুটি হৃদয়ের মিলন আকুতির সুর। অনাদিকাল ধরে পুরুষের প্রতি উদ্দিষ্ট নারীত্বের গাঁথা আমার মনকে দোলায়িত করছিল। সামান্য মাত্র দূরে দুটো লাল আলো যেন জ্বলছে। দুটো চুরুট জ্বলছে। আমার মনে হল যেন অনন্ত জীবন কেউ গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে চুরুট টেনে চলেছে।

"সামনে কোন্ গাঁ পড়ছে ?" পাড়াল জিজ্ঞেস করে।

"কালদারি।" রাঙ্গী জবাব দেয়। "ওঃ, এখনও অনেক দূর।"

"আজ সাবধান থেক......। নানা এখন নয়। সুবিধা বুঝে পরে। আমার কথা শুনছনা কেন বলতো।" রাঙ্গী অনুনয় ভরা কাতরস্বরে বলে।

"মাঝে মাঝে ছিনালটি পাশ ফিরছে।" পাড়াল বলে এবং একটি ছোট লাঠি নিজের হাতে নেয়।

"ওঃ, মাগো জীবন যাবে।" রাঙ্গী আস্তে তাকে টান দেয়। তারপরেই আকাশের গভীর কালো অন্ধকারের দিকে তাকায়।

আস্তে আস্তে আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। সারাটি নৌকা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কাছ থেকে সামান্য একটু দূরে তারা দুজন ফিসফাস কথা বলতে লাগলো। আমার ঘুম পাচ্ছে বটে কিন্তু পুরোপুরি বেহুঁস হতে পারছি না। বেশ দেখছি নৌকো অগ্রসর হচ্ছে। জল ছল-ছল করে আওয়াজ তুলছে। আর তীরের গাছগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। কেউই আর দাঁড় টানছে না। নৌকোর সবাই ঝিমুচ্ছে। রাঙ্গী আমাকে টপকে নৌকোর পাটাতনের উপর নেমে বসে পড়ে।

"ভাই কেমন আছ ?" রাঙ্গী জিজ্ঞেস করে।

"তুমি কেমন আছ তাই বল।" মাঝি জিজ্ঞেস করে।

"আমার স্বামী আমাকে সুন্দর সুন্দর যায়গায় বেড়িয়ে এনেছে। আমি সিনেমায় গেছিলুম। জাহাজ দেখে এলুম। জাহাজ মানে সাধারণ নৌকো নয়। ওগুলো এক একটা আমাদের গাঁয়ের মত বড় বড়। হাল যে কত বড় তা কি বলবো তোমাকে।" এই ভাবে রাঙ্গী অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে বিস্ময়-বৈচিত্র্যে-ভরা কথাবার্তা চালায়। সেই কথার তরঙ্গমালায় ঘুম পাড়ানী সুর যেন কোন যাদুস্পর্শে আমার চেতনাকে ধীরে ধীরে অচেতনতায় মিশিয়ে দিচ্ছিল।

"দেখ আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।" মাঝি বলে।

"বেশ হালটা আমার হাতে দাও। আমি সামলাব। তুমি বরং ঐখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।" রাঙ্গী বলে।

নৌকো আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গভীরতা দেওয়ার জন্যই বোধ হয় রাঙ্গী গুনগুনিয়ে গান সুরু করে।

"কোথায় লইয়া চললা মোরে ও সুন্দরী।
তোমার রাগ বিরাগের মাঝ দরিয়ায়,
(আমি) হাবু ডুবু খাইয়া মরি ও সুন্দরী।"

রাঙ্গীর কণ্ঠে পুরুষের গান। সেই গানের সুর বুঝি বা সকলের নিদ্রামগ্নতাকে গভীরতর করে দেয়। সে গানে যেন ঝঞ্জা, ঝড়, তুফানের মধ্যেও নিশ্চিত বিপদ মুক্তির আশ্বাস এনে দেয়। সে গানের মূর্চ্ছনায় আশা-নিরাশার সমস্ত দ্বন্দ্ব যেন নিশ্বেসে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

আমার কাছ থেকে মাত্র একটু দূরে পাড়াল মাথায় তোয়ালে বেধে বসে আছে। আমার মনে হল, তার ঐ ভাবে বসে থাকা এবং রাঙ্গীর প্রাণ

খোলা ঐ গানের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে। লোকটা ছাদ থেকে নেমে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢোকে। আমি একা চিৎ হয়ে শুয়ে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছি। রাঙ্গী একই ভাবে গান গেয়ে যাচ্ছে।

"মন্দিরের পেছনের গলিতে
এক যুবতী আছে।
বিনা আওয়াজে,
তুমি তার কাছে গেলে
সে যুবতী কে জান ?
ও আমার প্রিয়
যৌবনে ভরা সেতো আমিই, আমি।"

আমার ঘুম পাচ্ছে, রাঙ্গীর গান যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে আবার ডেকে তুলছে। ও গান যেন আস্তে আস্তে আমার মনে মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাঁয়ের কিসান যুবতীরা যেন তাদের প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে প্রাণ খুলে গান গাইছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা স্বপ্নালু আবহাওয়া আমার মনের চারিদিকে ঘুর ঘুর করছে। সেই স্বপ্ন রাজ্যে রাঙ্গী আর পাড়াল বিভিন্ন রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে গানের স্বর বন্ধ হয়ে যেতেই আমার মনের দরজাও বন্ধ হয়। বাইরের আর কিছু আমি শুনতে পাই না।

*　　　*　　　*

নৌকোয় সামান্য হৈ-চৈ হতেই ঘুমটি ভেঙ্গে গেল। নৌকো তীরে এসে ঠেকেছে। মাঝি-মাল্লারা দুটো হারিকেন নিয়ে বার বার ওঠানামা করছে। তীরে দু'জন লোক রাঙ্গীকে খুব শক্ত করে ধরে বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন কেরাণী যাঁর হাতে চাবুকের মত মোটা একটা দড়ি আছে। রাঙ্গীর পীঠে হয়ত এক্ষুণি চাবুক পড়বে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে তীরে যাই, তীরে গিয়ে। খোঁজ নিই—"কি হয়েছে।"

"সেই চোর ব্যাটা পালিয়েছে। অনেক মাল নিয়ে গেছে। এই শয়তান মাগী নৌকোটিকে ধারে ঠেকিয়েছিল। এই বদমাস হাল ধরে ছিল।" কেরাণী খুব ক্রুদ্ধ এবং নৈরাশ্যপূর্ণ ভাবে বলে যায়।

"কি নিয়ে গেছে ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"দুটো গুড়ের বস্তা, আর তিনটে তেঁতুলের বস্তা। আমি আগেই জানতাম। এই জন্যই ঐ লুটেরাটিকে নৌকোয় তুলতে বারণ করেছিলাম। এই লোকসানের জন্য মালিক আমাকে ছিড়ে খাবে। শালা কোথায় যে নেমে পালিয়েছে।"

"বাবুজি, কালদারির কাছে।"

"চুপ কর শয়তান মেয়ে। কালদারির কাছে আমি জেগেছিলাম।"

"তাহলে নিভদাবোলুর কাছে নেবেছে।"

"এ এখন এই ভাবে বলবে না। কাল আগুিলিতে একে পুলিশের হাতে দিয়ে দেব।...চল, ওঠ,—ওঠ নৌকোয়।"

"বাবু আমাকে এখানেই ছেড়ে দিন।"

"বেশী ঢং দেখাসনি। চল! ওঠ!" কেরাণী তাকে এক ধাক্কা মারে। দুজন মাঝি তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তোলে।

"সব বেটা কুম্ভকর্ণের দল। মাল দেখার নামে অষ্টরম্ভা। খালি ঘুমোতেই ব্যস্ত। তার হাতে হাল তুলে দিতে কে বলেছিল। তোদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কি সব একেবারে লোপাট হয়ে গেছিল।" কেরাণী সকলের উপর চোট দেখিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

রাঙ্গীকে ছাদের উপর বসানো হয়, তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন মাঝি নিযুক্ত হলো, আমিও আবার ছাদে উঠে বসি।

নৌকোটা আবার অগ্রসর হতে থাকে। আমি চুরুট ধরাই।

"বাবু, একটা চুরুট দেবেন" রাঙ্গী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে।

চুরুট ধরিয়ে সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, "ভাই, আমাকে পুলিশে দিয়ে কি লাভ বলতো।"

মাঝি জাবাব দেয়, "কেরাণীবাবু জানেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "পাড়াল তোমার স্বামী নাকি?"

"হ্যাঁ, উনি আমার স্বামী।" রাঙ্গী জবাব দেয়।

"আজ্ঞে, ও মিথ্যা কথা বলছে। একে ও ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। এর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি। ঐ লোকটার আর একটি বউ আছে।"—"এখন সে মাগী কোথায় আছেরে রাঙ্গী?" মাঝি জিজ্ঞাসা করে।

"কব্বুরিতে। এখনও শরীরে যৌবন আছে।...আমার মত কিল খেলে সেও আমার মত হয়ে যেত।"

"তাহলে তুমি ওর সঙ্গে থাক কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"বারে, উনি যে আমার স্বামী।" রাঙ্গী বলে, স্বামী কথাটার ওপরেই সমস্ত জোর।

"তাহলে পাড়াল ওর কাছেও যায়?"

"আমি না হলে ও টিকতে পারে না। তার মনটা রাজার মন বাবু। ওরকম স্বামী কোথায়ও পাওয়া যাবে না।"...

হঠাৎ মাঝি বলে ওঠে, "বাবু, লোকটার কারবার আপনি জানেন না। ও একবার এই রাঙ্গীকে কুঁড়ে ঘরে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এ বেচারি পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেল। ভাগ্যের খুব জোর আছে বাবু।"

"বাবু ঐ সময় পেলে আমি তার টুটিটা টিপে ধরতাম, আধপোড়া অবস্থায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।" কথাটি বলেই সে কাপড় সরিয়ে পুড়ে যাওয়া দাগটি দেখায়। অন্ধকারে সাদা একটি দাগ হঠাৎ মানুষকে চমকে দেয়।

"এত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেও তুমি তার পেছনে কেন লেগে আছ," আমি জিজ্ঞাসা করি।

"কি করবো বাবু, সে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, সমস্ত কিছু ভুলে যাই। মন যেন কি রকম হয়ে যায়। সে কত মোলায়েম সুরে কথা বলে বাবু। আজ সন্ধ্যার সময় যখন আমরা কুব্বর থেকে রওনা দিলাম, কি বলব বাবু, সারা রাস্তা ধরে সে বলতে লাগল, রাঙ্গী চল ঐ নৌকোয় উঠি। আর কিছু মাল নাবিয়ে নিই। আমি সাহায্য না করলে এ কাজ সম্ভব নয় বাবু।"

"তাহলে মালটি কোথায় নামালে?"

"আমি কি করে জানবো।"

হাসতে হাসতে মাঝি বলে, "চোরের সর্দ্দার, তুই আমাদের চোখেও ধুলো দিতে চাস?"

রাঙ্গীর চেহারাটা দেখে নেওয়ার ঔৎসুক্য আমার প্রবল হয়ে উঠলো। কিন্তু অন্ধকারে তাকে খুব আবছা দেখাচ্ছিল।

নৌকোটা আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। মাঝ রাতের পর থেকে হাওয়াটা

ক্রমশ ঠাণ্ডা লাগছে। গাছের পাতাগুলো নড়ছে। মাঝি দাঁড় টানছে। এখন আর আমার ঘুম পাচ্ছে না। পাহারা দিতে থাকা লোকটা ঘুমে ঢুলতে থাকে। রাঙ্গীকে দেখে মনে হল যেন সে পালানোর জন্য আর কোন চেষ্টা করবে না। সে আরামে বসে চুরুট টানছে।

"তোমার বিয়ে হয়নি ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না অল্প বয়সেই পাড়াল আমাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে।"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"ইণ্ডুনালেন।···সে সময় আমি জানতাম না যে সে মদখোর।·· আর আজকালতো আমিও খাই। মদ খাওয়া আর এমন কি দোষের কাজ। কিন্তু মদ খেয়ে সে আমার পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেয় সেখানেই হয় আমার দুঃখ।"

"তা হলে ওকে ছেড়ে দাও না কেন ?"

"মার খাওয়ার সময় তাই ভাবি। কিন্তু অমন স্বামী আর পাব না বাবু। আপনি জানেন না, সে যখন মদ খায় না, তখন তার ব্যবহার একেবারে মাটির মানুষের মত। আমি না থাকলে ওর মন ভেঙ্গে যাবে। ও মারা যাবে।"

তার কথাবার্ত্তার ঢং আমার কাছে বিচিত্র লাগলো। তাদের দুজনের মধ্যে বাঁধনটা যে কত দৃঢ় অথবা কত আলগা তার আমি কিছুই হাদিশ পেলাম না।

রাঙ্গী আবার বলতে সুরু করে, "আমরা দু'জনে কত চেষ্টা-চরিত্তির করেছি বাবু একটা কাজ জোগাড় করবার জন্যে। নিজেদের ঠিক মত গুছিয়ে নিতে বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাবু, আমাদের সে গুড়ে বালি। কিছুতেই কিছু হবার নয়। শেষ পর্যন্ত এই চুরির ধাঁন্ধা ধরতে হ'ল। আমার মা এই সে দিন মারা গেছে। সে আমাকে অনেক গালাগালি দিত। একদিন পাড়াল আমাদের কুঁড়ে ঘরে ঐ মাগীটাকেও নিয়ে এসেছিল।

"কাকে ?"

"আমার সঙ্গে তাকেও সে আমাদের কুঁড়ে ঘরে রাখতে চাইল। আমি ঐ মাগীটাকে এ্যায়সা ধোলাই দিয়েছিলাম যে, কি বলব। তারপর অবশ্য পাড়াল ভীষণ চটে গিয়ে, আমাকে মারধোর করেছিল। তারপর ওর সঙ্গে

ঐ মেয়েটা চলে যায়।...আরও একদিন সে এসেছিল। আমি দোর গোড়ায় দাঁড় করিয়ে যা মুখে এসেছে তাই শুনিয়েছি। ঘরে ঢুকতে দিইনি। সে সেখানে বসে বাচ্চা মেয়ের মত কান্না সুরু করে দিল। এতে আমার মনটা একটু নরম হয়ে এল। তার ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনির একমাত্র কারণ ছিল ঐ লোকটা। মুখে যা এলো আবার তাকে একবার শুনিয়ে দিলাম। তার কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে বলতে লাগলো 'ও ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না।' বিরক্তি ধরে গেল আমার, দোর গোড়া থেকে তাকে ঠেলে বের করে দিয়ে আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। অনেক্ষণ পর্যন্ত সেদিন আমি ঘুমুতে পারিনি। সবে আমি গা মোড়া দিচ্ছি, হঠাৎ দেখি ঘরে আগুন লেগেছে। দরজায় শিকল লাগিয়ে দিয়ে পাড়াল ঘরে আগুন লাগিয়েছিল। কেউ আমাকে সাহায্য করতে আসেনি। রাত তখন দুপুর, আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যেতে লাগলো। দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক সেই সময় কে যেন দরজা খুলে দিল। পরের দিন পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায়।...আমাকে জিজ্ঞেস করে 'কার উপর তোমার সন্দেহ হয়'—আমি সোজাসুজি বলেছি, পাড়ালের উপর আমার কোন সন্দেহ নেই। ছাড়া পেয়ে সন্ধ্যের সময় আমার কাছে এসে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মদ খেয়েও অমনি ভাবে কাঁদা ওর অভ্যেস। এমনিতে সে কাঁদে না। সব সময় তার মুখে হাসি লেগেই আছে। দুচার ফোঁটা মদ না গিললে তার মেজাজ থাকে না। আবার মদ খেয়ে বাচ্চাদের চেয়েও বেশী জোরে কাঁদতে সুরু করে। আমি নিজের যা কিছু সব তাকে দিয়ে দিই।"

"চুরির ব্যাপারে তুমি তার সঙ্গে থাক কেন?"

"কি করব বলুন। সে যখন বিড়বিড় করে আমার কাছে বলতে থাকে তখন আমি আর .....।"

"তুমি বলেছিলে না সে তোমাকে বিজয়নগরম্ প্রভৃতি সহরে বেড়িয়ে এনেছে।"

"ও সব ডাহা মিথ্যে কথা বাবু। আমার কথায় মাঝিমাল্লারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। এর আগেও এই নৌকেতেই দু'বার চুরি হয়ে গেছে।"

"পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে তুমি কি করবে।"

"কি আর করবো। আর আমাকে ধরেই বা তারা কি করতে পারবে। আমার কাছেতো আর চুরির কোন মাল নেই। কে জানে, কে নিয়ে গেছে। একদিন মার দেওয়ার পর ছেড়ে দেবে।"

"শেষ পর্যন্ত পাড়ালকেওতো ধরবে। সেতো চুরির মাল শুদ্ধু ধরা পড়বে—তখন।"

"সে ধরা পড়বে না বাবু। এতক্ষণে মাল হয়ত বিক্রিই হয়ে গেছে। তাকে বাঁচানোর জন্যই আমি নৌকোয় থেকে যাই।" কথাটি বলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর আবার আস্তে আস্তে বলতে সুরু করে, "এই সব মালের টাকা কে পাবে জানেন বাবু, সব ঐ বউ-বেটিই পাবে। যতক্ষণ তার উপর ওর মন বসে থাকবে, ততক্ষণ সেও তাকে ছাড়বে না। এ সব কষ্ট তার জন্যই আমাকে সইতে হয়। এই মাগীই দিনের পর দিন আমার রক্ত চুষে নিচ্ছে বাবু।"

এই কথাগুলোর মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন উত্তেজনা ছিল না। পাড়ালকে সে মনের মনিকোঠায় রেখেছে। পাড়ালের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। সে কোন আদর্শবাদী মহিলা নয়। আদর্শ পতিব্রতাও নয়। প্রেমিকাও নয়। কত বিচিত্র সঙ্কীর্ণ চিন্তা, ভাবনা, ঈর্ষা, রাগ-অনুরাগের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা নারীর হৃদয়। সে হৃদয় সমস্ত কিছুকে সহ্য করে একটি বিশেষ জায়গায়, নিজের মনের মানুষের জন্য সব কিছু সহ্য করতে সে প্রস্তুত। তার স্বামী একেবারে ভাল মানুষটি হয়ে সৎপথে চলুক, এই ধরনের সুনিশ্চিত কোন অভিপ্রায় তার নেই। সে তার পাড়ালকে ভালমন্দ সব শুদ্ধ আপন করে নিয়েছে।

হাওয়া এখন খুব জোরে বইছে। নৌকোটা খুব তেজের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। ক্লান্তি বিদূরিত করে বিশ্ব জেগে উঠছে। ক্ষেত-খামারে পাহারা দিতে থাকা কিসান ফিরে যাচ্ছে। শুকতারা দেখা দেবে এক্ষুণি। রাঙ্গী ঘুপ্‌টি মেরে বসে অব্যক্ত চিন্তায় বিভোর হয়ে ঠায় একদিকে চেয়ে রয়েছে।

"সে আমার! যেখানেই সে ঘুরে বেড়াক না কেন আমার কাছে ফিরে না আসলে সে থাকতে পারে না।" নিজের মনকে রাঙ্গী বুঝ দিচ্ছে। সে কথায়

আশা, বিশ্বাস এবং ধৈর্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয়। সেই একটি মাত্র কথা যেন তার জীবনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তি, ভয় এবং সহানুভূতির সঙ্গে সে কথা শুনে আমি নিশ্চুপ হয়ে থাকি। সকাল পর্যন্ত আমরা দু'জনে ঠায় ঐ ভাবে বসে থাকি।

নৌকো থেকে নাবার আগে, নিজের পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তার হাতে রেখে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অগ্রসর হই। সে কি বলবে, তার প্রতীক্ষা আর এক মুহূর্তও করিনি।

তার পর কি হলো, খবর রাখিনি।

মূক মানুষ

এম. জি. কে. গোখলে

য়ানাদিদের দাক্ষিণাত্যের বাগ্দী বলে ধরে নেওয়া যেতো। একমাত্র যদি তারা উপজাতির লোক না হতো। বাংলার বাগ্দীদের মত এরাও সমাজের উচ্চ বর্ণের ধনবান ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষায় এদের শক্ত-সমর্থ শরীরকে স্বল্পমূল্যে বন্ধক রেখেছে যুগ যুগ ধরে। এদেরই একজন য়ানাদি মুসলাইয়া। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণদের বাড়ীর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। শেষকালে নিরাশ হয়ে রামাইয়ার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"রামাইয়াবাবু, রামাইয়াবাবু" মুসলাইয়া বাইরে থেকে হাঁক দেয়। বাড়ীর ভেতর থেকে কোন আওয়াজ এলো না। কোন সাড়া পেল না সে। "কারো পাত্তা পাচ্ছি না কেন। কোথায় গেল সব," বলতে বলতে মুসলাইয়া ঘরের কড়া নাড়ে।

রামাইয়া লোকটি ভাল। তিনটি ছেলে-মেয়ে। আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত ও বাড়ীতে আছে। বাড়ী দেখলে গাড়ী থাকার স্বাভাবিকতাটাও মনে আসে। বাড়ীর সামনে ছোট্ট একটি বাগান।

দরজা খোলা ছিল, সেই ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোর একটা রেখা বারান্দায় পড়ছিল। সেখানে আর কেউ ছিল না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে মুসলাইয়া বারান্দায় উঠলো। হঠাৎ এমন একটা জিনিস তার নজরে পড়লো যা বারান্দায় থামের পাশে চক্ চক্ করছে।

মুসলাইয়া যেন এর আগে কোন দিন সে বাড়ীর গৃহিণী অথবা ছেলে-মেয়েদের হাতে অত চকচকে জিনিস দেখেনি। ঠায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলো সেই চোখ ধাঁধানো জিনিসটাকে। কি হতে পারে সেটি। এ নিয়ে চিন্তাও করলো কিছুক্ষণ। কিন্তু কিছু কুল-কিনারা করে উঠতে পারলোনা। শেষ পর্যন্ত সে নিজের সন্দেহ

দূর করার জন্য জিনিসটার কাছাকাছি গেল। তার মনে হল, দেরী হলে সেই উজ্জ্বল জিনিসটি হয়তো বা হারিয়ে যাবে। কাজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে তার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে আস্তে আস্তে চোখ দুটো অসম্ভব রকমের বিস্ফারিত করে মনোযোগ সহকারে দেখলো। একটি কলসী এবং তার পাশে একটি ঘটি। মুসলাইয়া যেন তার দিকে এক নজরে তাকিয়ে রইলো। স্থানকালের কথা তার মন থেকে উঠে গেল। সে এও ভুলে গেল যে, সে রামাইয়া বাবুর বারান্দায় আছে। এবং সে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। সে শুধু ঐ জিনিস দুটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সেদিনের সেই নিশুতি রাতের অন্ধকারে সেখানে ছিল মুসলাইয়া আর ঐ দুটি জিনিস। আজকাল বাজারে অত ভাল জিনিস পাওয়া যায় না, পেলেও তার মূল্য দিতে হয় অনেক বেশী। সাধারণ লোকের পক্ষে সে জিনিস কেনা স্বপ্নেরও অতীত। সুতরাং তেমন জিনিস দেখে বোকার মত হতবাক হয়ে ওর চেয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কী? মুসলাইয়া এক পা অগ্রসর হল। ঘরের ভেতর থেকে এগিয়ে আসা একটা পদধ্বনি তাকে চকিত করলো। মুসলাইয়া নিজের মধ্যে ফিরে এল। তার হঠাৎ মনে হল যেন এক্ষুনি কেউ তার গায়ে ঘুষি আর লাথি মারলো। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক দিল "মা"। ডাক দেওয়ামাত্রই সে যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেল।

"কে?" বলে রামাইয়ার স্ত্রী সিতাম্মা আধ খোলা দরজাটা পুরোপুরি খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সিতাম্মার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘর থেকে একটা সুগন্ধ এসে মুসলাইয়ার নাকের কাছে নাচতে লাগলো।

"মা আমি রানাদি মুসলাইয়া।" ইতিমধ্যে সে নিজেকে সামলে নিলেও কথাগুলো স্বাভাবিক গতিতে বেরুচ্ছিল না।

"কে মুসলাইয়া, তোর কী এমন হয়েছে যে তুই এত চিৎকার করে বাড়ীশুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছিস? উল্লুক, তোর হলটা কি, এত রাত্রে এখানে কেন? ..... আরে ঘরে তো কেউ নেই, কতক্ষণ তুই এখানে আছিস..... আমারতো মনেই ছিল না যে, বারান্দার দরজাটা খোলা আছে।...ছেলে-পুলেরাও হয়েছে তেমনি। আমাকে জ্বালিয়ে খাবে। এক মিনিট ঘরে থাকতে পারে না; পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে না বেড়ালে হতভাগাদের পেটের ভাত যেন হজম হয় না। বদমাইসগুলো এত বেপরোয়া হয়েছে যা বলার নয়। যাবি যা, দরজা বন্ধ করে যা। এদের আলায়

আর পারার জো নেই বাপু...আর শাস্ত্রী মশায়কেও বলি, এত রাত পর্যন্ত কোথায় যে আড্ডা মারে কে জানে!......হ্যাঁ, ভাল কথা। কইরে বললি না যে, কি দরকার তোর? কেন এসেছিস? যাক্, ভালই হ'ল এসেছিস।" সিতাম্মা এই ভাবে খুব তাড়াতাড়ি জলে ডুবতে থাকা মানুষের মত কথাগুলো বলে গেলেন।

"রামাইয়াবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মা।" মুসলাইয়া টেনে-টুনে বলে।

"উনিতো ঘরে নেই? জানিনা কোথায় আড্ডা জমিয়ে বসে আছেন। যাওয়ার সময়ত বলে যাওয়া হয় না। বউকে বলে যাওয়াটা উনি আবার পছন্দ করেন না। কই তুইত বললি না ওঁর সঙ্গে তোর কি দরকার।"

"কিছু না মা। এমনি কথা ছিল, ইয়ে মানে।"

"কি ইয়ে মানে, তোর মাথা-মুণ্ড। বিরক্ত করতে এসেছিস আমাকে। কিছু ঠিক করে বলতেও পারিস না। ওদিকে আমার রান্নার কাজও এগুচ্ছে না। কাঁচা কাঠ নিয়ে এসেতো দিয়ে গেল।...বেশ, ওঁর সঙ্গে কাল দেখা করিস। এখনও তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হবে। হ্যাঁ, এইবার যা দরজাটা বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, ভাল কথা মুসলাইয়া, একটু দাঁড়াতো। এই বলছিলাম কি, দু'কলসী জল নিয়ে আয়তো। জলটা আনতে আনতে হয়তো উনি এসে যাবেন। এক্ষুণি ভেতর থেকে কলসী এনে দিচ্ছি, দাঁড়া একটু। না ঠিক আছে, কলসী আর ঘটি তো এখানেই পড়ে রয়েছে। আজকাল বাজারে এ জিনিসের অনেক দাম। ভালই হল, ঠিক সময় তুই এসে গেছিস। এই কাজটুকু করে দে, মুসলাইয়া।" সিতাম্মা চট করে একবার ভেতরে চলে যায় এবং একটা লণ্ঠন নিয়ে ফিরে আসে। ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা এক সিঁকের সঙ্গে লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে দিয়ে মুসলাইয়ার হাতে কলসী দিয়ে বলে "তোর অনেক মঙ্গল হবে। ঐ দু'ড্রামে একটু জল ভরে দিয়ে যাস্।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, করছি মা। এক্ষুণি ভরে দিচ্ছি। আপনি নিজের কাজে যেতে পারেন।"

"না তার চেয়ে তুই বরং চল পাতকুয়ার কাছে আমি লণ্ঠনটা ধরি।...... হ্যাঁরে মুসলাইয়া, তোর বউকে শ্বশুর বাড়ী থেকে আনিসনি এখনো?"

"কি যে বলবো মা।"

"ও ! নিজের বউ সম্পর্কে বলতে বুঝি লজ্জা করে ? হ্যাঁরে মুসলাইয়া, তোকে দেখলেতো পাগলের মত মনে হয়। তোর বউটি কেমনরে ?"

"পাড়ায় তো ওকে সবাই সুন্দরী বলে।"

"তাই নাকি ! নাম কিরে তার ?"

"কিরে, ওর কথা পাড়তেই বুঝি খুব আনন্দ হল। ওর নাম নিতে লজ্জাও পাচ্ছিস বলে যেন মনে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে বউয়ের নাম বলতে স্বামীরা লজ্জা পায় না।"

"সে জন্য নয় মা ! নামতো তার শশীরেখা।"

"শশীরেখা ! খুব মিষ্টিতো। তুই তাহলে ভাল বউ পেয়েছিস বল। খুব সৌখিন নাম। ·····শহুরে গলি-ঘুঁজির মেয়ে নয় তো ?"

"না মা। তার ঠাকুরমার নাম ছিল শশীরেখা। সেই নাকি বউএর ঐ নাম রেখেছে।"

"তাইনাকি ?...হ্যাঁ—ব্যাস, ঐ কলসীটা ঐখানে রেখেদে। ভাল কথা। দেখ মুসলাইয়া, তোকে আরো একটু কষ্ট করতে হবে। গোয়ালঘরের পাশ থেকে একঝুড়ি ঘুটে নিয়ে এসে এই বারান্দায় রেখে দে।"

"যাই মা"।

"ব্যাস, এক্ষুনি ছেলেপুলেরা এসে যাবে। ওদের খাওয়াতে, ঘুম-পাড়াতেই রাত ভোর হয়ে যাবে। ও ভাল কথা, বাচ্চার ঐ চৌকিটা ওধারে পড়ে আছে, নিয়ে এসে রেখে দে তো।"

"আর কোন কাজ নেইতো মা ?"

"না বাবা, তোর মঙ্গল হোক।"

"রামাইয়াবাবু সন্ধ্যের সময় আমাকে আসতে বললেন।"

"হয়তো বলেছিলেন। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এখনও তো তিনি এলেন না। আর বলো কেন, আজকাল এত রাত করে আসেন।"

"সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন..."

"অঃ, হয়তো হবে।"

"আমি তাঁর কাছে চারগণ্ডা পয়সা চেয়েছিলাম।"

"অঃ !...আচ্ছা...এই যা সব ভুলে যাচ্ছি। রান্নাঘরে একগাদা কাজ পড়ে আছে। ওনার আবার রান্নায় খুঁত থাকলে চলে না।...এখনও আসেননি। এককাজ করো, তুমি বরং কালকে এসো।"

"মা,...একপোটাক...চাল।"

"এখনতো বাবা আমি কোন কিছু ছুঁতে পারিনে। রান্নার কাপড় পরে আছি যে! তুমি বরং অন্য সময় এসো। অঃ!...চলে যাচ্ছো? আর একটি কথা শুনে যাওতো বাবা। দরভাদের বাড়ীতে আমার বাচ্চাগুলো খেলাধুলো করছে। আমি ডাকছি বলে ওদের একটু ডেকে দাও। অন্ধকার হয়ে এলো এখনও বাচ্চাগুলো ফেরেনি।"

* * *

"সিতাম্মার বাচ্চারা ভেতরে আছে, থাকলে বলে দেবেন, ওদের মা ডাকছে।" মুসলাইয়া দরভাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে।

"কেরে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?" ঘরের সামনের দিকের ছোট্ট বাগানের এককোণে আরাম কেদারায় বসে দরভা সুব্বায়া প্রশ্ন করেন।

"আমি বাবু, মুসলাইয়া। সিতাম্মার বাচ্চাদের ডাকতে এসেছি।"

"ও তুমি নাকি, মুসলাইয়া এদিকে এসোতো। ওদের বাচ্চাগুলো এই মাত্র ফিরে গেছে রাঘবায়ার বাচ্চাদের সাথে। এতক্ষণে হয়তো পৌছে গেছে। মুসলাইয়া বসো—আহা, অতো দূরে বসেছো কেন? কাছে বসো।...এই আমার বাঁ পায়ের হাড়ে একটু চোট লেগেছে, বুঝলে। এত ব্যথা যে কি বলবো। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, এ যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে মরেই যাই। আবার ভাবি, বাচ্চাদের ছেড়ে যাই কি করে।"

"পা-টা কি মচ্‌কে গেছে বাবু? লাগলো কি করে?"

"এই সিঁড়ি দিয়ে নাববার সময়। ও ভগবান, কি যে পাপ করেছি! এই—এই, ঠিক এই জায়গায়। একটু দেখতো মুসলাইয়া...ওগো শুনছো? বলি করছো কি? তেলের বাটিটা এনে দাওতো।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ—শুনছি গো শুনছি, অত চেঁচাতে হবে না।...আচ্ছা মানুষ পেয়েছি কপাল গুণে। পান থেকে চুন খসলেই হ'ল, অমনি আকাশ-পাতাল এক করে বসে থাকবে। বলি পাড়াপড়শীরা এসব চিৎকার শুনলে কি বলবে তার খেয়াল

আছে। কি বলো; আমি রান্না করছি। খালি হাতে তো আর বসে নেই।···এ আবার কে?"

"যেই হোক। আমি এদিকে ব্যথায় মরে যাচ্ছি। তোমারতো সেদিকে খেয়ালই নেই। চুপ করার জন্য মাষ্টারি করছো। তেলের বাটিটা দিয়ে তোমার যা কাজকর্ম করগে যাও। রান্না করেতো আর আমায় উদ্ধার করে দেবে না। যাও, যা ইচ্ছে কর। আমি এখানে কাতরে মরি, মরবো।"

"সারা দিন ঘরে বসে বসে উদ্ধার তো তুমিই করে দিচ্ছ। আমার জন্য কী আর বাকী রেখেছ।"

"ব্যস, হয়েছে, খুব হয়েছে। বকবকানিটা বন্ধ করে নিজের কাজ দেখগে, যাও।···হ্যাঁ, দেখ মুসলাইয়া, এই তেল দিয়ে এই জায়গাটা একটু মালিস করে দাওতো। দেখি, তোমার হাতের গুণে যদি একটু কমে যায়। ও ভগবান!"

"আজকাল বাবু সবাই যে যার ব্যথাই দেখে। কি যে সময় পড়েছে।"

"হ্যাঁ, তা তুমি, তুমি ঠিকই বলেছ। আজকাল মোটা-তাগড়া লোক বলতে প্রায় নেই-ই। সকলের চেহারাই একেবারে লিক্‌লিকে। আর লোকগুলোও তেমনি অলস হয়ে পড়েছে। ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। এখন ডাক্তারদের বাজার। আমার ঠাকুরদাদার সময় লোকে এতো ভাত খেত, ঘড়া-ঘড়া দুধ-দই খেতে পারতো। আর আজকাল—চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি—একটা লোক তার সিকি ভাগও খেতে পারে না। আমি নিজেই দেখেছি, এক গামলা পিঠে এক মিনিটে সাবাড় করে দিতে পারতো। আমাদের গাঁয়ের বিষ্ণুমন্দিরের পাশের যে বিরাট পাথরের রথ আছে সেটাকে একধাক্কা মেরে নাড়িয়ে দিতে পারতো। আর কয়েক জন ধরে সে রথ যখন চালাতো আজকালকার মোটর গাড়ীর চেয়েও কম জোরে যেত না সেটা।...ওঃ! আর একটু আস্তে মালিস কর ভাই। একটু আস্তে মালিস কর।···এখন কলিযুগের পালা। ফসল বাড়ছে। তবে বাড়লে কি হবে, যে যার লুটে-পুটে খাচ্ছে!"

"ধান কাটার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও একদিনেরও কাজ পাইনি বাবু। কত চেষ্টা করেছি তবু দিন মজুরিপাইনি। আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বাবু।"

"আমিওতো সেই কথাই বলছিলাম। ভগবান এবার নতুন ভাবে আবির্ভূত হবে। রাক্ষুসে প্রবৃত্তিগুলোকে একেবারে লোপাট করে দেবেন! নতুন যুগের সৃষ্টি হবে।"

"আমাদের পাড়ায় এমন একটিও ঘর নেই, যেখানে উনুন ধরেছে। লোকে একমুঠো ভাতের জন্যে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"এবার সারা বিশ্বে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। লোকের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। রাক্ষসদের সংহার হবে। শিব নিজে রুদ্র রূপ ধরে এসে সমস্ত তচ্‌নচ্‌ করে দেবেন।"

"রাত অনেক হয়ে এলো, বাবু। কাল সকাল থেকে আমরা তুটো প্রাণী একমুঠো ভাতও মুখে দিইনি। খুব খিদে পেয়েছে, বাবু।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাত তো অনেক হয়েছে দেখছি। ইস, আমার খেয়ালই ছিল না। থাক বাবা এবার মালিশ বন্ধ কর। হ্যাঁ, এই দেখ ঐ হাতে যে তেলটুকু লেগে আছে তা আমার গোড়ালিতে একটু লাগিয়ে দেতো। হ্যাঁ, ব্যস।...ওগো শুনছো! গরম জল হয়েছে? হয়েছে কিনা?"

"রামাইয়ার কাছে সকালে চার আনা পয়সা চেয়েছিলাম। উনি সন্ধ্যের সময় আসতে বললেন। কিন্তু এখনও তাঁর দেখা পাচ্ছি না। হয়তো অনেক রাত করে ফিরবেন। আপনি একটু দয়া করবেন বাবু। তুদিন ধরে একটি দানাও পড়েনি পেটে। তু'মুঠো ভাত দেবেন?"

"অঃ! এই কথা। তা বাবা দেখ এখনতো ঘরে কিছুই নেই। এখন বল দেখি তোমায় কি ভাবে সাহায্য করি। এই আজ সকালে ঠাকরার কাছ থেকে একটি টাকা ধার করে এনেছি। তাও কি হাতে রাখার জো আছে। গিন্নীটি এসে আকাশ-পাতাল এক করে দিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছেন। দেখি, ভেতরে খোঁজ করি চাট্‌নিবাট্‌নি কিছু আছে কিনা।... ওগো শুনছো?"

"খাওয়ারই যখন একমুঠো নেই তখন আর চাট্‌নি নিয়ে কি করবো বাবু। আপনি বরং একমুঠো চাল দিলে তবু কিছু আমাদের পেটে পড়তো।"

"চালেরতো বাবা দাম চড়চড় করে বাড়ছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, চাল আজকাল বাজারে পাওয়াই যাচ্ছে না। ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমাদের

গোলা তো, এখনও খোলা হয়নি। বুঝতেই তো পারছো বাবা, পায়ের এই অবস্থা নিয়ে কি করেই বা কি করি। এক হপ্তা ধরে চেষ্টা-চরিত্তি করছি, কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছি না। দুঃখের দিনে একজনকেও হাতের কাছে পাইনা। ঘরের খবর বলতে নেই পরকে। আমাদের নিজেদেরই আশপাশের বাড়ী থেকে ধার করে তবে হাঁড়ি চড়েছে। কি দুরবস্থায় যে কাটছে দিনগুলো! ভগবান কবে যে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন।...হ্যাঁ, দেখ, এতক্ষণে হয়তো রামাইয়া বাড়ীতে ফিরেছে। তুমি বরং ওর সঙ্গেই দেখা করো। হ্যাঁ, ভাল কথা। এদিকে কোনদিন এলে আমার কাছে একটু হয়ে যেও, ভুলোনা কিন্তু। জয় ভগবান!"

* * *

অনেক রাত করে রামাইয়া বাড়ী ফিরলেন।

"কোথায়? গরম জল কোথায়? তোয়ালে? তোয়ালে কই? নাও ভাত বাড় তাড়াতাড়ি।" ঘরে পা রেখেই খুব ঝাঁঝালো গলায় স্ত্রীকে আদেশ করলেন। ভাবটা যেন, বাইরের অনেক লোকের অনেক ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে এসেছেন। ঠিক এই সময় মুসলাইয়া পা টিপে টিপে এসে দরজায় কড়া নাড়ে।

"আজ্ঞে আপনি সন্ধ্যের সময় আসতে বললেন।" দরজা খোলার পর রামাইয়াকে সামনে দেখতে পেয়ে য়ানাদি মুসলাইয়া কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলে।

"বাপরে বাপ! তুই যে একেবারে কাবুলিওয়ালার মত কাঁধে বসে আছিস, যা যা এখন যা। কালকে দেখা করিস। কাল দেখা যাবেখন। দেখি কতদূর কি করতে পারি।...এখন আমাকে বিরক্ত করিস না।" রামাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেন।

মুসলাইয়া রামাইয়ার বাড়ী থেকে সোজা জাঁদরেল ব্যবসায়ী চেঁচায়ার দোকানের কাছে গিয়ে এককোণে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে না পারা স্পন্দমান তার মুখটা জাবররত পশুর মুখের সঙ্গে তুলনীয় মনে হচ্ছিল।

"কিরে মুসলাইয়া। তুইতো খুব 'কোরটোয়েন্টি' লোক দেখছি। তুই বলেছিলি সকালে এসে দুটো কাঠ কেটে দিয়ে যাবি। কৈ এলি না তো।" আড়চোখে মুসলাইয়ার দিকে একনজর রেখে, জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে

বলে উঠলেন স্থূলবপু চেঁচায়া। "এই য়ানাদি জাতটাই এই ধরনের ফাঁকিবাজ" সেই গাঁয়েরই এক জোতদারের ছেলে চুরুট বাঁধতে বাঁধতে মুসলাইয়ার দিকে একঝলক দেখে নিয়ে নিজের রায় পেশ করলেন।

"আপনি একি কথা বলছেন মহাজন। আমিত আর গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি না। কাল ঠিক আপনার কাজ করে যাবো। একমুঠো চালের জন্যে যে কোনো কাজ করতে আমি তৈরী বাবু। আর আপনার কাজ করতে তো আমার আনন্দই লাগে। কাল এসে ঠিক আপনার কাঠ কেটে দিয়ে যাবো।"

"আমি জানি তোদের উপর ভরসা করা বোকামি। তোদের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে ব্যবসা আমার ডকে উঠবে।…যাক, ঐ বাইরে পড়ে থাকা ধানের বস্তাগুলো এই লাটের উপর রেখে দেতো।"

"এই এক্ষুনি রাখছি বাবু। আপনার খুব দয়া হবে—পোটাক চাল যদি ধার দেন। কাল থেকে আমাদের দুই প্রাণীর পেটে একদানাও পড়েনি। এই চালের দামটা আমি কাল সন্ধ্যের মধ্যেই চুকিয়ে দেব।"

"মুসলাইয়ার কথাগুলো বেশ মিষ্টি। দাম চুকিয়ে দেব, না চুকিয়ে দেওয়াটাকেই একেবারে চুকিয়ে দেবে!"—চুরুট বাঁধতে থাকা লোকটি আবার নাক গলায়।

"তা যা বলেছ। তোমার অবস্থা দেখে আমার সত্যি দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল, এখন আমি সমস্ত হিসেবনিকেশ শেষ করে দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছি। গণেশঠাকুরের কাছে বাতি দেওয়াও হয়ে গেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি এত লোককে ধার দিয়েছি যে, আর নূতন কাউকে ধার দিতে ইচ্ছা করে না। বাজারে আর কত টাকা ফেলে রাখি বলো। হাতে টাকাপয়সা না থাকলে তো আর ব্যবসা চলে না। আর তুমি তো জান, আজকাল ব্যবসায় লাভ তো দূরের কথা উল্টো ঘর থেকে দিতে হয়। থাক, এ সব হল গিয়ে ব্যবসার কথা। তুমি আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর তোমাকে বলে লাভ কি। হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল ভোরের সময় এসো। আরে দেবো দেবো, আমিতো আর দোকান নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি না।"

"একটু দয়া করুন বাবু। খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি।"

"তুমিতো বাপু নিজের কথাটিকেই ফলাও করে বলছো। এখন আমি আর কি করতে পারি বলো। এই মাঝ রাতে কি ধার চাওয়ার সময়?……আরে

এই, ঐ ধানের বস্তাগুলো ভেতরে রেখে গেলি না, অমন পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছিস কেন।"

"বাবু আমার কান্না পাচ্ছে, আপনি জানেন না ক্ষিদে কি জিনিস। অন্ততঃ এক মুঠো চালও যদি দেন।"

"আচ্ছা নাছোড়বান্দাতো। দোকান বন্ধ করার সময় এমন অলুক্ষুণের মত কাঁদছে দেখনা। নে বাবা নে ধর। ভেবেছিলাম এই গুড়ের টোপলাটি ছেলেটিকে দেবো।"

*　　*　　*　　*

"বলি, এতক্ষণ ছিলে কোন চুলোয়? তুমিতো জান কাল সকাল থেকে উনোন ধরেনি। আর এই হু'দিন পরে এখন তুমি খালি হাতে ফিরলে। এ ভাবে আমাকে না খেতে দিয়ে মারছ কেন, বলতে পারো? খেতে দিতে না পার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। না খেতে পেয়ে তোমার এখানে মরার চেয়ে ওখানে মরা অনেক ভালো।" মুসলাইয়াকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শশীরেখা তেলে-বেগুনে চটে যায়।

"কি বকবক করছো। চলো ভেতরে, চলো বলছি।" খালি হাত ঝুলিয়ে মাথা হেট করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে মুসলাইয়া।

"না ভেতরে গিয়ে আর কাজ নেই। আমাকে এক্ষুনি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"পাঠিয়ে দাও বললেই হল আর কি। স্বামী বেঁচে থাকতে কেউ যায় নাকি বাপের বাড়ী? ছেলেমানুষি রেখে ঘরের ভেতরে চলো।"

"আঃ! আমার হাত ধরে টানছো কেন? ছেড়ে দাও আমাকে।"

"ভিতরে এসো না। সব বুঝিয়ে বলছি।"

"বুঝিয়ে আবার বলবে কি? ঘরে একদানা চাল নেই। উনি আবার আমাকে বোঝাতে যাচ্ছেন।......আরে! একি করছো বলতো? তোমার ওসব পিরিত রেখে দাও এখন।"

"রেখে দেব কেন। ...... বসো আমার সামনে।"

"আমি বসবো না—যাও।"

"বসবে না মানে।......হাড় গুড়ো করে দেবো, জানো?"

"তাই করে দাও। আমি মরে বাঁচি। এভাবে আধ মরা হয়ে বাঁচার চেয়ে তোমার হাতেই আমার মরণ ভালো!"

"ছি ছি; এসব বাজে কথা কেন বলছো বলতো? তোমাকে কি আমি সেই ভাবে দেখি। দিন ভাল না হলে আমি কি করবো বলো। কত লোক কত রকমের কাজের ফরমাস করে—আমিতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের সে কাজ করি। কিন্তু কেউ যদি পাই পয়সা না ঠেকায়, আমি কি করতে পারি বলো। আমরাতো মানাদি জাত। ভদ্রলোকের গায়েতো আর হাত দিতে পারবো না। না হয় দু'দিন না খেতে পেলাম তা—আর কি করবো বলো।"

"এ গাঁয়ের লোক খুব চামার; মানুষ মরে গেলেও একটু সাহায্য করে না কেউ।"

"সাহায্যের কথা না হয় রেখেই দিলাম। কাজ করে দিলেও পাই পয়সা ঠেকায় না।......আমি তোমায় কতবার বললাম। ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে ঝিগিরির জন্য চেষ্টা কর। তুমি আমার সে কথায় আমলই দিলে না।"

"ওগো না, আমল দিই। তবে ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো আমার দিকে যে ভাবে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকায় তাতে আমার ভীষণ লজ্জা করে।...... তোমাকে কতবার বলেছি কতকগুলো নারকেলের পাতা আনতে, চাটাই বুনে দিতাম, বিক্রি করতে, পয়সা পেতে। আমার সে কথায় তো কান দেবে না।"

"আমাকে খাটিয়ে নিয়েই কিছু ঠেকায় না। আবার আমরা দুজনে খেটে চাটায়ের কারবার করে তার দাম না পেয়ে মরি আর কি। চুলোয় যাক্ ওসব কারবার। আমাদেরও দিন আসবে। ওদের এই সব কুকর্মের পাহাড়গুলো জমা হোক। চিরকাল আর এই ভাবে মুখ বুঝে ভূতের বেগার খাটতে হবে না!"

"দেখ, কালকে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও, আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করবো। তুমি কাজ করে পয়সা আদায় করতে পারো না। আমি পয়সা না নিয়ে ছাড়বো না।"

"বেশ তাই হবে, দুজনে একসঙ্গেই যাবো। হ্যাঁ, দেখ ঘরে শুট্কি মাছ আছে না। আজ বরং শুট্কি মাছ ভাজাই খাওয়া যাক্। কি বল, তাই ভাল। আজ এ ভাবেই কেটে যাক্।"

"আঃ! ছাড়। একে চুলে তেল নেই, তারপর ওগুলো টেনেটুনে একেবারে জংলি ভূতের ছিরি করে দেবে দেখছি। ছাড়ো বলছি, ও সব পিরিত আমার ভাল লাগে না, হ্যাঁ।"

"পেটে নেই ইন্দি,
ভজরে গবিন্দি

ফেনকেন্দ্র

কোড়াওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও

"আচ্ছা, আপনারা কি ভাতের ফেন ফেলে দেন ?"

"সকালের দিকে ফেলে দিই—তবে সন্ধ্যের দিকে তা ভাতেই শুকিয়ে যায়। কেন বাবা কি দরকার ?"

"কিছু না এমনি, আপনাদের বাড়ীতে ত গরু-মোষ নেই—তাই ভাবছিলাম, আপনারা হয়ত বা ফেনের কদর বোঝেন না।"

"ফেনের কদর ? হুঁ ! আমিত রান্না ঘরের বাইরে এমনিই ফেলে দিই।"

"তা হলে আপনি একটা কাজ করবেন ?"

"কি বলত বাবা ?"

"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে ফেনটা রোজ আমাকে দিয়ে দেবেন।"

"তোমাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাকে, আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন কেন ? রায়ালসীমার দুর্ভিক্ষ লাগার সময় সেখানে যে ফেনকেন্দ্রগুলো চালানো হয়েছিল তার কাজ-কর্ম সন্তোষজনক নয় বলে আমাদের অফিসার জানালেন। এই ফেন নিয়ে আমাদের এখন রীতিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও নানা ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করেছে।"

"বেশত, তাতে এমন চিন্তা-ভাবনা করার কি আছে ? আমি প্রত্যেকদিন ফেনটুকু তোমাকেই দেব।"

পঙ্কজম নিজের ঠাকুরমা আর শ্রীনিবাস রাওয়ের মধ্যে চলতে থাকা এই কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে শুনছিল। শ্রীনিবাস রাও তাদেরই বাড়ীর এককোণের এক ছোট ঘরের ভাড়াটিয়া। কথাগুলো শুনে পঙ্কজমের খুব রাগ হল। সত্যি কথা বলতে, শ্রীনিবাস রাওকে দেখলেই পঙ্কজমের

মনে কেমন যেন একটা "দেখতে নারি" ভাবের আবির্ভাব হতো। ওর প্রতি এই অসহিষ্ণু ভাবের উৎসটা যে কি তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। এদিকে শ্রীনিবাস রাও পঙ্কজমের ত বটেই, অন্য কারোর কোন দিন এতটুকু ক্ষতি করেনি। বরং সব ক্ষেত্রেই সে সকলের সাহায্যে যথোচিতভাবে এগিয়ে আসত। ওদের বাড়ীর বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ সে সারিয়ে দিত। একবার এমন কেরামতি দেখিয়ে দিল যে, যা বলার নয়। টিম্ টিম্ করে জ্বলতে থাকা বালব-গুলো ওর স্পর্শে হঠাৎ যেন ফিরে পেলো চোখ ঝলসানো ঔজ্জ্বল্য। লেখাপড়ার ব্যাপারেও পঙ্কজমকে মাঝে মাঝে সাহায্য যে না করত তাও নয়। মানুষটি এমনিতে ভাল। তবে নিয়মিত ভাড়া চুকিয়ে দেবার বেলায় অন্য পদের। এই ভাড়া দেবার বেলায় অবশ্য পঙ্কজমের এত চিন্তা-ভাবনা করার কিছু ছিল না, আসলে তার বাবাও ভাড়ার জন্যে চিন্তিত থাকত না।

শ্রীনিবাস রাওয়ের ঘরে সব সময় বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা লেগেই আছে। যারা আসে চট্ করে ফেরার নামটি করে না। এতেও পঙ্কজমের বয়সী মেয়েদের অন্ততঃ আপত্তির কিছু থাকার কথা নয়। সব দিক ভাল ভাবে বিচার করে দেখলে এ স্থির সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে, শ্রীনিবাসকে পছন্দ না করার পেছনে বিশেষ কোন কারণই ছিল না। কিন্তু তবুও পঙ্কজম খুব সন্দেহ করত। এমনিতে দীর্ঘ ছ'মাস শ্রীনিবাস রাও তাদের ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকলেও তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে শুনতে সে পারেনি। সে যে কোথায় কাজ করে, খাওয়া-দাওয়া কি ভাবে চলে, কোথায় তার বাড়ী, কত মাইনে পায়, এসব প্রশ্নের একটিরও জবাব দিতে পঙ্কজম পারবে না। এ সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা পঙ্কজমের ত দূরের কথা তার বাবারও ছিল না। কালেভদ্রে যদিও বা দু'একটি প্রশ্ন করা যেত তার জবাবে শুধু তার ঠোঁট নড়ত মাত্র। আওয়াজ যদিও বা বেরুতো তা এত অস্পষ্ট যে বলার নয়। আর যাওবা শোনা যেত তাতে পরিষ্কার কিছু একটা ধারণা করে নেওয়ার মত মালমশলা থাকত না।

নবাগত শ্রীনিবাস রাওকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গিয়েছিল যে, সে কোন এক অফিসে রেকর্ড কিপারের কাজ করে। অনেকদিন পর অন্য একদিন কথায় কথায় পঙ্কজম জানল যে, সে আপার ডিভিসন ক্লার্ক। ফলে রেকর্ড কিপারের কাজটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেল যে, তার দুমাস

আগেই শ্রীনিবাস সে কাজ ইস্তফা দিয়েছে। আসলে এ দুটো কথাই পঙ্কজমের কাছে মিথ্যা মনে হয়েছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে একদিন শ্রীনিবাসকে পাকরত অবস্থায় দেখতে পেল পঙ্কজম। এরপর প্রশ্নোত্তরে জানা গেল যে, সে যে হোটেলে খেত সেই হোটেলের একজনের কলেরা হওয়ায় সেটি বন্ধ হয়ে গেছে—তাই এই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কথাটা পংকজম্ অবিশ্বাসী মন নিয়ে বিশ্বাস করল বটে কিন্তু শহরের অন্য হোটেলগুলো সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে শ্রীনিবাস রাওয়ের উত্তর হলো "হোটেলে খাওয়া আর নিরাপদ নয়।"

জবাবে পঙ্কজম্ বলে, "হোটেলে খাওয়া নিরাপদ নয় সত্যি, তবে আপনার কথায় বিশ্বাস করা আরও কম নিরাপদ।"

পংকজম্ লক্ষ্য করলো, রান্না সেদিন হয়েছিল বটে, তবে তরকারী বলে কোন বস্তু যে ঐ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে তা সম্ভবত ভদ্রলোকের অজ্ঞাত ছিল।

পংকজম্ অবশ্য তার সে অজ্ঞতাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য গায়ে পড়েই এগিয়ে গিয়েছিল। মহাশক্রুরও এ ধরনের বোকামী মেয়েদের কাছে অসহ্য। আর সেই জন্যই পংকজম্ ওর কাজে একটু হাত লাগিয়ে দিয়েছিল।

সেই দিনই পংকজম্ তার ঘরে প্রথম ঢুকলো। জিনিসপত্র কিছু না থাকলেও গাদায় গাদায় বই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ঘরের এদিকে-ওদিকে। অবস্থা দেখে শ্রীনিবাস রাও সম্পর্কে ভাল ভাবে জেনে নেওয়া পংকজমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এটুকু সে বুঝতে পারলো যে, ওর কাপড়জামা বিশেষ নেই। কিন্তু বাইরে ঘোরাফেরার সময়ত বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধোপ-দুরস্ত থাকে লোকটা। সে যাই হোক, পরিধেয়ের সংখ্যা একুনে দুটির বেশী কোন মতেই নয়। পংকজম্ এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হলো।

এই ছ'মাসের মধ্যে দু'দুবার সময় মত ভাড়া দিতে পারেনি শ্রীনিবাস। একবার শোনা গেল, তার বোনের অসুখ বলে চিঠি আসায় হাতে পয়সা-কড়ি যা ছিল পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক একইভাবে আর একবারও সে তার কোন এক আত্মীয়কে সাহায্য করেছে বলে জানালো। পংকজমের কাছে ঘটনা দুটোই মিথ্যা বলে মনে হল। এত অভাব থাকা সত্বেও তার মুখ দেখেতো কোন সময় মনে হয় না যে, সে অভাবগ্রস্ত। চিন্তার কোন রেখাই তার মুখে নেই। কোন মাসে ভাড়া চুকিয়ে দিতে না পারলে পরের মাসে সে একসঙ্গেই

দু'মাসের দিয়ে দিত। কিন্তু তার মুখ দেখে ধরার উপায় নেই যে সে কোথাও থেকে ধার করে এনেছে। আর তার দোরগোড়ায় টাকা আদায় করতে কেউ কোন দিন আসেওনি। পংকজম্ ভাবে,—হয়তো লোকটার রোজগার কম, তবে হিসেবি। এমন যে আজব লোক শ্রীনিবাস—সে আজ কেন চাইতে এসেছে! আবার বলে কিনা ফেনের কি যেন সব করবে। ভদ্রলোকটি কেন যে বুঝতে পারছেনা যে আজকাল ও সব বানানো কথায় কারো বিশ্বাস হয় না। পংকজম্ অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথা চিন্তা করে।

চার দিন পর।

"কী মা, মনে হচ্ছে আজ যেন আপনি ফেনটুকু ভাতেই শুকিয়ে ফেলেছেন?"

"না বাবা। ফেন আজ অন্য কাজে লেগে গেল। পংকজম্ তার কাপড় ইস্তিরি করার জন্য লাগিয়ে দিল। তোমার খুব বেশী দরকার থাকলে রাত্রে দেবখন।"

"না থাক। আচ্ছা, কি খেলে পিত্ত কমে যায় বলুনতো?"

"কেন বাবা, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ মা, শরীরটা কদিন ধরে একটু খারাপই যাচ্ছে। সব সময় পেটে যেন এক দারুণ ব্যথা। এ অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া না করাই ভাল ভাবছি।"

"পুরোনো আমলকির আচার আছে, দু'এক টুকরো খেয়ে নিও। আগের চেয়ে তুমি এমনিতেই দুর্বল হয়ে গেছ। তার উপর কিছু না খেলে আরো দুর্বল হয়ে পড়বে।

"বেশ তাই দিন, তা দিয়েই হোটেলে দু'এক মুঠো খেয়ে আসি।"

"তার জন্যে আবার হোটেলে যাবে কেন বাবা, এখানেই খেয়ে নাও।"

ঠাকুরমা শেষ রায় দিয়ে বসলেন। সব মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার এই কথা শুনে পংকজম্ চিন্তা করে। শ্রীনিবাস রাও-এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার ফলে তার প্রত্যেক কথাই মিথ্যা বলে মনে হয় পংকজমের। বিশ্বাস হয় না তার কথায়।

আধঘণ্টা পরে ঠাকুরমা ডাক দেয় "পংকজম্"।

রান্নাঘরের দিকে উকি মেরে পংকজম্ জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে বল"।

"ঐ ছেলেটিকে একটু ডাকতো দিদি"।

পংকজম্ শ্রীনিবাস রাওয়ের ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখে নেয়। সে শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মনে হলো, পংকজম্ তার ভাবনায় নিজেই কিছুটা লজ্জিত হয়। ছিঃ, যত খারাপই হোক, কারো সম্বন্ধে এমন অলক্ষুণের কথা চিন্তা করা মহাপাপ। আরও কাছে এগিয়ে যায় পংকজম্।

"এই যে শুনুন," পংকজম্ ডাক দেয়। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। কয়েকবার ডাকার পরও যখন লোকটা কোন জবাবই দিলে না তখন পংকজম্ উচিৎ-অনুচিতের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে জাগালো। শ্রীনিবাস চোখ খুলতেই সে বল্লে—"খাবেন আসুন।"

"থালায় বেড়ে এখানেই এনে রেখে দাও, পরে খাবখন"।

কথাটা শেষ করেই শ্রীনিবাস আবার চোখ বুজলো।

পংকজম্ এই খবর ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দেয়। ঠাকুরমা বড় থালা আর একগাদা বাটি সাজিয়ে পংকজম্‌কে সেগুলো তার ঘরে রেখে আসতে বল্লেন।

"উনিতো শরীর খারাপ বলে খাবই না বলেছিলেন, আবার তুমি এত সব দিলে কেন?" পংকজম্ জিজ্ঞেস করে।

"এতে কীইবা এমন আছে দিদি, না খেলে না হয় ফেলে দেওয়া যাবে। এগুলো নিয়ে যাও। আর বলে দিও প্রথমে চাট্টিখানি ভাত যেন আমলকির আচার মিশিয়ে খায়। একগ্লাস রসম্‌ও নিয়ে যাও। ওমা, একটু ঘি নিয়ে যাবি না? আর ঐ কাচের গ্লাসে ঘোল আছে। এগুলো রেখে এসে ওটা নিয়ে যাস।"

*   *   *   *

পংকজমের বাবা খেতে বসেছেন। তার মা পরিবেশন করছিলেন। ওদের দু'জনের মধ্যে পংকজমের বিয়ে-থার সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল।

"হ্যাঁ, ছেলেটি এখানেই ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেবেলাতেই বাপমাকে হারিয়েছে। তার দাদাই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। পড়িয়েছে। আজও পড়াচ্ছে। ছেলেটিকে আমি দেখে এসেছি। দেখতে শুনতে ভালই।" বল্লেন প্রসাদ রাও।

"তাহলে তো ভালই। বিয়ের পর ছেলে এ বাড়ীতেই থাকবে। আমি বাদে সংসারে তোমার বলতে পংকজম্ ছাড়া কেউতো নেই। মেয়ে-জামাই এখানেই থাকবে। তোমারও ভাল লাগবে। সংসার বেশ জমজমাট হবে।"

"কি বাবা, ডালটা ঠিক আছে ?"

"ঠিক আছে মানে ? আজ ডালটা অদ্ভুত ভাল হয়েছে।"

"তাই নাকি। আমি ভেবেছিলাম ডাল বোধহয় একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। কারণ আমার মনে হল নুন যেন একটু বেশী পড়েছে। ডাল বেশ ভালভাবে ফুটিয়েছি।"

"না, না, খারাপ কোথায়। বেশ সুন্দর হয়েছে। আর একটু নিয়ে এসতো মা।"

প্রসাদ রাওকে ডাল দেওয়া হল। মুখে ভাত তুলতেই হঠাৎ কার গোঁঙানি মেশানো অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল।

"কিসের আওয়াজ যেন।"

"শ্রীনিবাস রাও হবে" পংকজম্ বলে।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের পিছন দিকে পংকজম্ গিয়ে দেখে শ্রীনিবাস রাও যা কিছু খেয়েছিল সব বমি করে বসে আছে। শরীরটা যখন ভাল নেই এত সব খাওয়ার কি দরকার ছিল,—এই কথাটি ভেবে তার উপর পংকজমের খুব রাগ হল। যা খেলে হজম হয় না, তা খেয়ে বাহাদুরি দেখানোর কি মানে হয়। যা পারবো না তাতে এগিয়ে লাভটা কি।

পরক্ষণেই কিন্তু শ্রীনিবাস রাওয়ের অসহায় অবস্থা দেখে, তার মনে একটু যেন করুণা হলো। কাছে গিয়ে দু'হাতে ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালো সে। তারপর কুলকুচি করার জন্য জল এনে দিল।

"আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি,"—শ্রীনিবাস রাও ক্ষীণকণ্ঠে বলে।

"আপনি অত সব না খেলেই তো পারতেন," পংকজম্ উত্তর দেয়।

"না, আসলে এমন বেশী কিছু খাইওনি," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রীনিবাস রাও বলে।

"ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন বলুন তো," পংকজম্ জিজ্ঞাসা করে।

"না, ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ নেই," এতো তেমন কোন শক্ত অসুখ নয়,- শ্রীনিবাস বিড়বিড় করে বলে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রসাদ রাও ডাক্তার ডেকে আনে। তার মনে ভয়, পাছে লোকটির কলেরা হয়।

ডাক্তার এসে দেখেশুনে জানিয়ে দেয়, বিশেষ কিছু নয়, সামান্য পেটের অসুখ

মাত্র। একটু দুর্বলতা ছাড়া আর অন্য কোন ভয় নেই। দুধ, ফল, মাছমাংস, হরলিক্‌স ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শও সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। প্রসাদ রাও ডাক্তারের পরামর্শানুসারে কতটুকু পরে আনিয়ে পংকজম্‌কে দিয়ে শ্রীনিবাসের ঘরে পৌঁছে দেয়।

পংকজম্‌কে দেখে শ্রীনিবাস রাও উঠে বসে। দুর্বল হলেও মুখে তার দীনতার ছায়ামাত্র নেই। "এসব জিনিসের কি দরকার," সে বলে।

পংকজম্ এ সব কিছু বুঝতে পারেনি।

"ডাক্তার বলে গেছেন না?......এগুলো কি আপনার দরকার নেই?" পংকজম্ বলে।

"দরকার নিশ্চয় আছে। খুব আনন্দের সঙ্গেই এগুলো আমি নিয়ে নেবো। তবে আমার যা দরকার তা এসব নয়।"

"তাহলে আপনি কি চান?"

শ্রীনিবাস রাওএর মুখে এক বিষণ্ন হাসি।

"আমি চাই চাকুরী, পয়সা। উপোসী পেটে হঠাৎ এত ভাল খাবার পড়লে তার ফল খারাপই হয়। আপনারা মিছেমিছিই ডাক্তার ডেকে এনেছেন। আমি আপনাদের খুব অসুবিধায় ফেলেছি।"

জীবনে এই প্রথম পংকজম তার কথায় বিশ্বাস করে। "তাহলে কি আপনার এই সব চাকরীর কথা মিথ্যা ছিল?"

"না, মাদ্রাজের একটা দপ্তরে আমি কাজ করতাম, তারপর অন্ধ্ররাজ্য গঠনের পর কুর্নুলের একটি অফিসে কাজ ধরলাম। তাঁবুতে থাকতে হত। আমাদের তাঁবুতে ছিল পাঁচজন লোক। একজনতো প্রথম দিনই ইস্তফা দিয়ে চলে গেলো। আর দু'জন আশপাশের অফিস দপ্তরে কাজ জুটিয়ে নিয়ে চলে যায়। এর মধ্যেই আমার অসুখ করে। কেউ জিজ্ঞেস করারও ছিল না যে, আমি মরেছি না বেঁচে আছি। ওষুধতো দূরের কথা, একটু জল দেবারও লোক ছিল না। এক সপ্তাহ পরে আমার জ্বরটা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হল, রবিবারেও আমাকে কাজ করতে হবে; কোন রকম ছুটি মঞ্জুর হবে না। বাধ্য হলেম ইস্তফা দিতে। এখানকার এম্‌প্লয়মেন্ট্ এক্সচেঞ্জের দয়ায় দেড় মাস দুমাস স্থায়িত্বের দুটি কাজ পেয়েছিলাম। এখন আবার বেকার। সপ্তাহখানেক হল পেটে কিছু পড়েনি

কাকেই জানাই যে আমার চাকুরী নেই। আমি উপোসী। ধারই বা কে দেবে। ভাড়া দিতে দু'চার দিন দেরি হলেই আপনাদের চাউনিটা বদলে যায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে ধার-দেনা করে ভাড়া না চুকালে হয়তো এতদিন ফুটপাতে উঠতে হ'ত।

"সত্যিই তো", পংকজম বলে।

"কি বাবা, কিছু খাবে?" বুড়ি ঠাকুর মা দোরগোড়ায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করেন।

শ্রীনিবাস রাও বুকের ওপর বই রেখে মনে মনে পড়ছিল। পড়ার চেয়ে হয়ত ভাবনাটাই ছিল বেশী। ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন।

"না থাক মা।" সে বলে।

"থাকবে কেন?" আমি তোমার জন্যে কিছু হাল্কা রান্না রেঁধেছি।

শ্রীনিবাস রাও উঠে বসে এবং ঠাকুরমার সঙ্গে যায়। ঠাকুরমা রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে সযত্নে তাকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে নিজেই পরিবেশন করেন।

"ঘরে কেউ নেই নাকি মা?" শ্রীনিবাস জিজ্ঞেস করে।

"মেয়েটার বিয়ের কথা চলছে। বাপ-বেটিতে ছেলে দেখতে গেছে।" পংকজমের পুরো সতেরো বছর হল। বিয়েতো দিতেই হবে বাবা।" ঠাকুরমা বলেন।

"দেখুন ঠাকুরমা, একটু কম করে দেবেন। সত্যি কথা বলতে কি, সকালে অতগুলো খাবার পাঠিয়ে দিলেন···যার ফলে এই অবস্থা হল।"

"হঠাৎ ওরকম হ'ল কেন বাবা?"

"বললাম, খুব কম দিন। আপনার হাতটাই যেন কেমন। আপনার হাতের রান্না কি রকম যেন থালা-বাটি সব চেটে না খাওয়া পর্য্যন্ত মন উঠতে চায় না। উচ্ছের তরকারীটা অদ্ভুত সুন্দর হয়েছিল। জীবনে এই প্রথম এত ভাল রান্না খেতে পেয়েছি।"

ঠাকুরমার মুখ আনন্দে একেবারে লাল হয়ে উঠলো।

"তাহলে উচ্ছের তরকারীটা খুব ভাল হয়েছিলো বলছো।" ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন।

'ভালো' নয়, অদ্ভুত রকম ভালো হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি উচ্ছে

ভালই বাসিনা। কিন্তু আজ সেই উচ্ছেই খুব ঠেসে খেয়েছি। তবে বমি হয়ে বেরিয়ে গেলো এই যা দুঃখ। এখন কোন হাল্কা খাবার দিন।”

“কী বা রেঁধেছি! রসুনের চাট্নি আর হিং দেওয়া রসম্। এই যা! আমিত ভুলেই গেছি। মুগের ডাল দিয়ে বানানো শাকও আছে। ওটাও একটু খেয়ে বল কেমন হয়েছে?”

“না মা, আর দেবেন না।”

“একটুখানি দিচ্ছি বাবা, দু’গাল না হয় বেশীই খেলে।”

“বা! এর স্বাদটাত ভারী ভালো হয়েছে।”

“আর একটু বাবা, আর একটু দিই”—বলতে বলতে ঠাকুরমা সেদিনও বেশ পেট ভরেই খাইয়ে দিলেন। প্রত্যেকটা রান্নাই শ্রীনিবাস রাওয়ের কাছে দারুণ ভালো লাগলো।

“তোমারত ভালো লাগছে বলছ বাবা, আমার ছেলেরও আমার হাতের রান্না খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার নাতনীর মুখে, আমার হাতের একটা রান্নাও রোচে না। প্রত্যেক রান্নাতেই সে একটা না একটা খুঁত বার করবে।”

“এ সব নিজের রুচির উপর নির্ভর করে, মা।”

“তোমার কথাই ঠিক বাবা,” ঠাকুরমা হাসতে হাসতে জানালেন।

“বাবা আর মেয়ের বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় ন’টা বাজলো।

“তাকে কিছু খাইয়েছ কি?” ঠাকুরমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পংকজম্ জিজ্ঞাসা করে।

“সে অনেকক্ষণ খেয়ে গেছে দিদি, ভাল কথা—বাবা, ছেলে দেখে এসেছত?” ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন।

“দেখে ত এসেছি,” প্রসাদরাও উত্তর দেন।

“কি হলো?” ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন।

“তাকে দশ হাজার টাকা পণ দিতে হবে।”

“ঠাকুরমা আমার খুব খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো”, পংকজম কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে। “দশ হাজার,” ঠাকুরমা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে।

"কি হলো ঠাকুর মা, বলছি না খুব ক্ষিদে পেয়েছে," পংকজম্ একটু চটে গিয়ে তাড়া দেয়।

"থাক, থাক—দশ হাজার টাকা দিয়ে দুটো জামাই কেনা যাবে।" প্রসাদরাও ভীষণ চটে গিয়ে বলে।

পংকজম্ খেতে বসে প্রত্যেকদিনের মতই নাকে-মুখে গুঁজতে আরম্ভ করে। "এই শাকটাকে এ ভাবে যাচ্ছেতাই করে দিলে কেন বলত? কী রকমের ছিরি হয়েছে দেখনা যেন চিরতার জল," পংকজম্ রান্নার খুঁত ধরতে আরম্ভ করে।

"দেখ, ঐ ছেলেটা তোর চেয়ে হাজার গুণ ভালো। সে আমার হাতের প্রত্যেকটি রান্না খুব প্রশংসা করেছে। ছেলেটা কত বুদ্ধিমান!"

"হ্যাঁ, বাবা তুমি এক কাজ করলেইত পার। এই ধরনের একটা ছেলের সঙ্গে পংকজমের বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই করে রাখলেই ত পার। রাজা-রাণীর মত দুজনে হেসে-খেলে থাকবে - দুধে-ভাতে।" ঠাকুরমা বলেন।

ভাবী ডাক্তার জামাইয়ের বাড়ীর ঠাটবাট আর পণের জন্য চাওয়া টাকার অঙ্কটা এখনো প্রসাদ রাওএর চোখ ঝলসাচ্ছে, কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। কাজেই ঠাকুরমার এই প্রস্তাব তার মনে লেগেছে। মনের মত হয়েছে তাই তিনি আড়চোখে তাকালেন নিজের মেয়ের দিকে। পংকজম্ হঠাৎ এমন ভাব করে বসে থাকে যেন এদের কারো কোন কথা তার কানে একেবারেই যায়নি। এক মুহূর্ত্ত আগে যে তরকারীটার হাজারো খুঁত ধরছিল, সেই তরকারীটাই চেটেপুটে সাবাড় করে দিতে যেন সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো।



প্রদীপ শিখা

কে. টি. গোপিচন্দ

উনিশ শতক তখনো বিদায় নেয়নি।

শ্বশুর-শাশুড়ী কুঁড়ে ঘরের মাঝামাঝি বসে কি যেন বিড়বিড় করে কানাঘুষা করছে। শ্বশুরের নাম ভেঙ্কাইয়া আর শাশুড়ীর নাম ভেঙ্কাম্মা। বিয়ের দিন সবাই বলাবলি করেছিল, "নামের কি সুন্দর মিল!"

এদের বউমার নাম সীদ্দাম্মা আর ছেলের নাম সীনাপ্পা। সীনাপ্পা মাস ছ'য়েক আগে থেকে বাড়ী ছাড়া। আজও তার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ তাকে ধরার জন্যে সব রকম চেষ্টাই করছে।

সীনাপ্পার ফেরারী হওয়ার একমাত্র কারণ……

তাদের গাঁয়ে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সে বছর বৃষ্টি পড়েনি। সেখানকার চাষ বৃষ্টির জলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৃষ্টির অভাবে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

সীনাপ্পার বাবা খুব অনুনয়-বিনয় করে তহশীলদার রামাইয়ার পাঁচ একর জমি ভাগ চাষ করার জন্যে নিয়ে দিন কাটাত। কোনদিন ভাত কাপড়ের অভাব তেমন ভাবে দেখা দেয়নি। আর তহশীলদারের কাছেও কোনদিন ঋণী থাকতে হয়নি।

সেই বছর ফসলের একটি দানাও ঘরে উঠেনি বলেই ভেঙ্কাইয়া তহশীলদারকে অনুরোধ করে বলে, "আগামীবারে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঋণ শোধ করে দেব।"

কিন্তু রামাইয়া সে অনুরোধে কান দেয়নি। ওসব কথায় কোনদিন কোন কৃষক তার মন গলাতে পারেনি। গলায় পা দিয়ে, ভেঙ্কাইয়ার দুটো বলদ, গরু আর মোষ,—যার সঙ্গে সেদিন বাছুর হয়েছে,—আর ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো নিলামে তুলে সে নিজের পাওনাটা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়।

হাত থেকে জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর অসুখ করে। সীনাপ্পা মজুরি করতে বেরোয়। ফসল যখন হয়নি মজুরিই বা পাবে কোত্থেকে।

আস্তে আস্তে আশ-পাশের গাঁগুলোতেও দুর্ভিক্ষের করালছায়া দেখা দেয়। এই অসহ্য অবস্থার মধ্যে আর থাকতে না পেরে হঠাৎ একদিন গাঁয়ের সবাই জোট বেঁধে রামাইয়ার বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। তাদের মধ্যে সীনাপ্পাও ছিল।

বিক্ষুব্ধ জনতা ঢিল মেরে পাটকেল খায়।

"ব্যাপার কি, তোমরা সব হঠাৎ এখানে কেন?" রামাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

"কই কিছুনা ত!" সীনাপ্পা জবাব দেয়।

রামাইয়া বলে, "কিছু না থাকলে কি আর এসেছ। নিশ্চয় কিছু আছে।"

"তা ধরেছেন ঠিকই, কিছু না থাকলে কি আর আসি", কথাটা সীনাপ্পা বলল বটে তবে এরপর কোন্ কথাটি বলা উচিত তা সে যেন ঠিক করতে পারছে না। ইতিমধ্যে ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে:

"আমরা ভাত চাই, ভাত!"

"আমার কাছে ভাত কোথায়?"

"তোমার কাছে নেই ত কি আর তোমার ঠাকুদ্দার কাছে আছে?"—সীনাপ্পা বলে।

"মুখ সামলে কথা বল," রামাইয়া খুব রেগে বলে ওঠে।

"ফসলের গুদাম খুলবে কিনা?" সীনাপ্পা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

সীনাপ্পার মুখে গুদাম ঘরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত নিরস্ত্র জনতা সেই দিকে ধাওয়া করতে উদ্যত হতেই কে জানে কোত্থেকে হঠাৎ একদল পুলিশ এসে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে দেয়। চোখের পলকে ছয় জনের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই সুযোগে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ায় অনেকে ধর-পাকড়ের শিকার হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই রামাইয়ার উপর সীনাপ্পা ভীষণ চটে ছিল। তার পরের দিনই আর একটা ঘটনা ঘটে। সীদ্দাম্মাকে রামাইয়া ছলে-বলে-কৌশলে নিজের ঘরে ডেকে এনে চোখের চামড়া পর্য্যন্ত না রেখে তার দিকে খারাপ মতলবে দৃষ্টিপাত করে। সীদ্দাম্মা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এসে সীনাপ্পাকে জানিয়ে দেয়।

"কি ব্যাপার?" সীনাপ্পা তহশীলদার রামাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে।

"ব্যাপার আবার কিসের? কই কিছু হয়নি ত।" রামাইয়া নির্বিকার ভাবে বলে।

"না, হয়েছে।"

"বল, তাহলে কি হয়েছে।"

"দু-মুঠো চিড়ে খাওয়ালে ছাগলদের চরিয়ে বেড়াবে?"

"হু!"

"বাঘ আসলে ভয় পাবে না ত?"

"তা পাব কেন।"

সঙ্গে সঙ্গে সীনাপ্পা হাতে মাথা কেটে হাত জুড়োয়। রামাইয়ার মাথায় লাঠি চালিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কি ভয় পেয়ে গেলে যে?"

লাঠির আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে রামাইয়া মাটিতে পড়ে যায়। আঘাতটা তত জোর না হলেও রক্ত ঝরেছে! রক্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে সীনাপ্পার মনে পড়ে যায় পুলিশের কথা। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।......তারপর থেকেই সে ফেরারী আসামী।

তখন সীদ্দাম্মা সাত মাস গর্ভবতী। ঠাকুরপোর কাছে স্বামীর অমঙ্গল ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা হয়ে যায়। অকালেই তার সন্তান প্রসব হয়।

সীনাপ্পা চলে যাওয়ার পর থেকে ঘরের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। যখন তখন পুলিশ এসে ঘুরে যেত। গাঁয়ের সবাই নিশ্চুপ থাকত। তহশীলদার রামাইয়া সব সময় ওৎ পেতে বসে থাকে সুযোগ পেলেই ছোবল মারার তালে। এই ব্যাপারেই সীদ্দাম্মার শ্বশুর-শাশুড়ী নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করছিল ঘরের এক কোণে বসে।

"ধরে নাও যে সে ছেলে আমাদের পেটে জন্মায়নি।"

"ধরে নিলেই কি সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে।"

"না হওয়ার কি আছে শুনি?"

"ছাই হবে।"

"তা হলে আর বুক চাপড়ে কাঁদছ কেন?"

"মায়ের মন তুমি কি বুঝবে।"

"চুলোয় যাক অমন মায়ের মন।"

"চুলোয় কে যাবে ?"

"সেই যাবে।"

"সেই মানে। কথার প্যাঁচ কষছ কেন ?"

"বললাম ত মায়ের মন।"

"সে কি।"

"সে আর কিছু নয়। তহশীলদার।"

"যে গেছে সে কি আর ফিরে আসবে না ?"

"মাথা খারাপ হয়েছে তোমার, সে ফিরবে কোন দুঃখে ?"

"কেন ফিরবে না ?"

"ফিরে এলে ত আমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে।"

এইসব কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে সীদ্দাম্মা কান পেতে শুনছে। আর থাকতে পারে না। চার দিন ধরে ঘরে একটা দানাও নেই। কোন কিছুই যখন ছিল না নিরুপায় হয়ে শাক-পাতা যোগাড় করে এনে সিদ্ধ করতে উনুনে চাপায়। মনে একটা ভয় আছে, কিছু না খেলে বুকে দুধ হবে না, দুধ না হলে কোলের বাচ্চাটাকে বাঁচান যাবে না। শাকপাতা উনুন থেকে নাবানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ী—এতক্ষণ যারা ঘরের কোনে ঘুপটি মেরে বসে কানাঘুষা করছিল-তারা আস্তে আস্তে এসে বলে, "আমাদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে বউমা, খেতে দে।" এরাই এতক্ষণ সীনাপ্পা সম্পর্কে যা তা বলছিল।

"কথাবার্ত্তা সব হয়ে গেছে ?" সীদ্দাম্মা একটু রেগে জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, তা হয়ে গেছে,"

"চাল নিয়ে আসুন,"

"কোত্থেকে ?" ভেঙ্কাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

"সরকারের পক্ষ থেকে চাল দেওয়া হচ্ছে না ?"

"সকালে গেছলাম।"

"তাহলে আনলেন না কেন ?"

"চালত সে দিচ্ছে"...ভেঙ্কাইয়া আর কিছু বলতে পারল না।...

"তহশীলদার রামাইয়া," ভেঙ্কাম্মা বলে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সীদ্দাম্মার খুব রাগ হয় শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর।

তারা এমন ভাবে কথা বলছে যেন তাদের চাল না পাওয়ার পেছনে একমাত্র সীনাপ্পাই দোষী। তারা হয়ত ভেবে বসে আছে রামাইয়াকে তার স্বামী প্রচণ্ড ভাবে মারধোর করেছে। এবং সেই কারণেই গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ লেগেছে।

"যা হোক কিছু ত আনবেন।"

"কি বলছ বউমা, বুঝতে পারছি না।"

"যাচ্ছেন না কেন?" সীদ্দাম্মা চিৎকার করে বলে।

"তহশীলদার রামাইয়া…" ভেঙ্কাইয়া বলতে শুরু করে।

সীদ্দাম্মার মনে অতীতের কোন এক ঘটনা উঁকি মারে। হঠাৎ বলে "বেশ তা হলে অন্ততঃ শাক-পাতা কুড়িয়ে আনুন।" বউমার মুখ দেখে শ্বশুর-শাশুড়ীর কি রকম একটা ভয় লাগল।

"ওঠ বুড়া"

"চল"

তাদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীদ্দাম্মা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

* * * * *

সীদ্দাম্মা গত ছ'মাস ধরে সীনাপ্পার প্রতীক্ষায় আছে। সে বেচারা কি জানে যে তার একটা ছেলে হয়েছে। জানতে পারলে কত না খুশি হত। পাড়া-পড়শীরা বলে ছেলেটা নাকি অবিকল বাবার রূপ পেয়েছে। এসব কথা ভেবে সীদ্দাম্মার মন আরও খাঁ খাঁ করে ওঠে। সীদ্দাম্মার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছেলেটাকে দেখার জন্য কোন না কোন দিন অবশ্যই তার স্বামী আসবে। এই আশায় বুক বেঁধে সব সময় সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে ছেলেটাকে সুস্থ-সবল রাখতে। রামাইয়ার কল্যাণে ত গরু-মোষ সবই গেছে। কাজেই এখন বাচ্চাটার একমাত্র সম্বল মায়ের বুকের দুধ। এই জন্যেই সীদ্দাম্মা শ্বশুর-শাশুড়ীর আগেই ছাই-পাস যা পায় তাই দিয়ে নিজের উদর ভরে নেয়। সীদ্দাম্মাকে কোন একজন জানাল সে নাকি সীনাপ্পাকে আদবানী লঙ্কায় দেখতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে ভাল করে খোঁজ নিতে ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেয়। সেদিন থেকে আরও উদ্বিগ্নভাবে তার প্রতীক্ষা করছে সীদ্দাম্মা। প্রত্যেকদিন পাহাড়ে চড়ে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকায়। সে চাউনিতে আছে হাতের লোহা বজায় রাখার সুতীব্র ইচ্ছা।

মনে তার তুষের আগুন। আজ পাহাড়ের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপোকে দেখতে পায়।

"কি খোঁজ পেয়েছ?" সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে।

"আমি কে বলত?" ঠাকুরপো জিজ্ঞাসা করে।

"সীনাপ্পার ভাই,"

"খোঁজ পেয়েছি।"

সৌদামিনী যেন নতুন জীবন পেল। শৈশবের একটা গানের দু'কলি মনে পড়ে গেল। গুন গুন সকরুণ কণ্ঠে সে গান ধরে :

"তুষের আগুন ঘুষিয়া জ্বলে গো—
সেই ভাবনা জ্বলে আমার গো প্রাণ—
কোন বা দেশে রইলারে সোনার চাঁন।"

"ছেলেটার সম্পর্কে বলেছ ত?" সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে।

"আমাকে কি আর বলার সুযোগ দিয়েছে।"

"কেন?"

"আমার বলার আগেই দাদা জিজ্ঞাসা করে।"

"কি জিজ্ঞাসা করেছিল?"

"সে সব আর শুনে কাজ নেই, তবে এটুকু বলতে পারি যে, বলার সঙ্গে সঙ্গে দাদার মুখে যে আনন্দ উচ্ছ্বলতার ভাব দেখেছি তা এর আগে কোন দিন আমি দেখিনি।"

"তাই না কি?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঠাকুরপো ঐখানেই মাটিতে বসে পড়ে। সৌদামিনী লক্ষ্য করল দীর্ঘ পথ হাঁটার জন্যে তার ঠাকুরপোর পা দুটো ফেটে গেছে। বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরছে। কোলের বাচ্চাটাকে পাথরের উপর বসিয়ে আস্তে আস্তে তার পা টিপতে টিপতে বিড় বিড় করে বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।.......

"আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম কবে বউদি?"

"কুড়ি দিন হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?"

"সে কেমন আছে ঠাকুরপো ?"

"ভালই আছে, বলছে দেশ উদ্ধার করবে।"

"ভারী এসেছেন একেবারে দেশ উদ্ধার করতে।" সীদ্দাম্মা দরদ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে।

"হ্যাঁ, আর কিছু থাকুক আর না থাকুক বুকের পাটা আছে।"

সীদ্দাম্মা "হ্যাঁ আছে" বলে সায় দেয়।

সীদ্দাম্মা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়। পা টেপা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ঠাকুরপোর দিকে চেয়ে থাকে। ততক্ষণে ঠাকুরপো উঠে বসেছে। বাচ্চাটা কাকাকে দেখতে পেয়ে খিল খিল করে হাসে। তৎক্ষণাৎ ঠাকুরপোর আর একটা কথা মনে পড়ে যায়। "দাদা, আসবে।"

"কবে ?"

"রবিবারে।"

"মানে···আজকেই !"

"হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময়।"

সীদ্দাম্মার হঠাৎ মনে পড়ে গেল শৈশবের দেখা পুতুল নাচের কথা। যখন তখন সীনাপ্পা আর সে গাইত—

"নায় বাড়ী লইয়ারে বাইন্সা লাগায় সাধের সাজনা,
সেই সাজনা বেচিয়া দিব মহারাজের খাজনারে—
প্রাণ আমার যায় হায়রে—নায় বাড়ী লইয়ারে···"

"ইস, একেবারে সিংহরাজ" সীদ্দাম্মা দরদ ঢালা সুরে বলে।

"তা হলেও বুকের পাটা আছে বলতে হবে।"

সীদ্দাম্মা, "হ্যাঁ, তা আছে"।

ঠাকুরপোর সঙ্গে ঘরে এসে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী এককোণে গুটি-গুটি মেরে বসে কি যেন চিবোচ্ছে।

সীদ্দাম্মাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিবোনো বন্ধ করে দিয়ে তার দিকে তারা এমন ভাবে ড্যাব ড্যাব করে তাকায় যেন তারা হাতে-নাতে চুরি করতে ধরা পড়েছে।

"মুখে, কি ওটা" সীদ্দাম্মা জিজ্ঞাসা করে।

"জল।" ভেঙ্কাইয়া বলে।

"করছেন কি ?"

"চিবোচ্ছি।"

ভেঙ্কাম্মার কোলে লুকানো একটা পুঁটলি সীদ্দাম্মা দেখে নেয়। কেড়ে নিয়ে দেখে চাল।

"কোত্থেকে এনেছেন ?"

"আনতে বলেছিলে না তুমি।" ভেঙ্কাইয়া জবাব দেয়।

"আমরা এনেছি," ভেঙ্কাম্মা বলে।

"কোত্থেকে ?"

"পাতা" ···· ভেঙ্কাইয়া বলে।

"না···না···তহশীলদার" ভেঙ্কাম্মা বলে। সীদ্দাম্মা চালের পুঁটলি হাতে নিয়ে ঠায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

"তহশীলদারের মাথা আর আপনাদের মুণ্ডু।" সীদ্দাম্মা বলে।

"তার পরেই আমাদের মুখে ছাই।" ভেঙ্কাম্মা বলে।

"ঐ ছাইভস্ম যা হোক একটা কিছু।" ভেঙ্কাইয়া বলে।

সীদ্দাম্মা বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসে কাকের নীড় নিয়ে। উনুন ধরিয়ে চাল বসিয়ে দেয়।

ভাত হচ্ছে। ঠাকুরপো অসাড়ভাবে খাটে শুয়ে পড়ে। শ্বশুর-শাশুড়ী অর্ধনমিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভাতের হাড়ির দিকে। তাদের চোয়ালের কোণ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

তক্ষুণি একজন পুলিশ আসে। এসেই বলে, "তোমরা সব গুম হয়ে বসে আছ কেন ?"

শ্বশুর-শাশুড়ী দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশের উপর ভেঙ্কাইয়ার খুব রাগ হল। এমনিতে আগে থেকে তার মেজাজ বিগড়ে ছিল। কারণ সীদ্দাম্মা তাদের খেতে দেবে কিনা সন্দেহ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হল পাছে পুলিশ ব্যাটাচ্ছেলে উনুনের উপরে থাকা ভাতের হাঁড়িটা ভেঙ্গে-চুরে ভাত ছড়িয়ে কাক জড়ো করে।

"কি ব্যাপার তোমাদের ?"

"কই কিছুনাত ?" ভেঙ্কাইয়া বলে।

"তোমার ছেলে কোথায় ?"

"রেঙ্গুন চলে গেছে নাকি।"

উত্তরটা পুলিশের মনের মত না হওয়ায় বন্দুকের উল্টো পিঠ দিয়ে বুড়োটাকে গুতো মারে।

ক্ষুধার্ত ভেঙ্কাইয়া আঘাত খেয়ে কাতর আর্তনাদ তোলে।

"পুলিশকে তোরা সব ভেবেছিস কি! অ্যা!"

"আমি কিছুই ভাবিনি দারোগাবাবু," ভেঙ্কাইয়া সকাতরে বলে।

পরমুহূর্তেই রান্না ঘরে ঢোকে ঐ পুলিশ। ভাত ফুটছিল। সীদ্দাম্মা উনুনের কাছে বসে আছে। ভেঙ্কাইয়া পুলিশের পেছনে আস্তে আস্তে যায়। তার একমাত্র ভয় ভাতের হাঁড়িটা না ভেঙ্গে দেয়। পুলিশকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সীদ্দাম্মা খুব ভয় পায়। কারণ সীনাপ্পার সেদিন রাত্রেই আসার কথা আছে - পাছে যদি এই পুলিশটা জেনে যায়।

"আরে হট, হট এখান থেকে।" সীদ্দাম্মা এমন ভাবে বলে যেন সে কুকুর তাড়াচ্ছে, কিন্তু সেখানে ত আর কুকুর ছিল না।

"ভাত রাঁধছ, বুঝি?" পুলিশ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, দু'মুঠো চাল ফুটোচ্ছি।" সীদ্দাম্মা জবাব দেয়।

"তা চাল কোত্থেকে আনলে শুনি?" পুলিশ জিজ্ঞাসা করে। "চুরিটুরি করে আননি ত?"

তৎক্ষণাৎ ভেঙ্কাইয়ার মনে হল এই বুঝি ভাতের হাঁড়িটা ভেঙ্গে দেয়।

"এই যে পুলিশবাবু" ভেঙ্কাইয়া ডাক দেয়।

"কী?"

"চাল কোত্থেকে এসেছে তা জান?"

"না।"

"চাল নয়। ওসব পাতা"……

"না…… না ……তহশীলদার"…. ভেঙ্কাম্মা তক্ষুণি রান্না ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে। তহশীলদারের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাড়ে কাঁপুনি ধরে। হাঁড়ির দিকে আর এগোতে সাহস করে না। শুধু সীদ্দাম্মার দিকে লোলুপদৃষ্টি মেলে বলে, "আমি যাচ্ছি, কেমন?" যেতে যেতে আবার ভেঙ্কাইয়াকে বন্দুকের গুঁতো মেরে যায়।

"আমাকে মারল না কেন ?" ভেঙ্কাম্মা জিজ্ঞাসা করে।

"আমাকে যে বাঘের মত ভয় করে।" ভেঙ্কাইয়া বলে।

সীদ্দাম্মা ঠাকুরপোর স্নানের জন্য গরম জল দেয়। ঠাকুরপোর পিঠে সাবান মাখিয়ে দেয়। স্নানের পরে ভাত বেড়ে দেয়। ঠাকুরপো খেতে বসে।

"বুড়ো-বুড়িদের বলনা কিছু।" সীদ্দাম্মা বলে।

"কি ?"

"ঐ যে তার আসার কথা।"

"বলে দিলে কি হবে ?"

"তারা চুপ করে থাকতে পারবে না" সীদ্দাম্মা বলে, "কথা ছড়িয়ে পড়বে, পুলিশ এসে ঘিরে ফেলবে বাড়ী।"

"বুঝেছি, তা হলে বলব না।"

সীদ্দাম্মার ঠাকুরপো যতক্ষণ খাচ্ছিল ততক্ষণ তার শ্বশুর-শাশুড়ী প্যাট্ প্যাট্ করে সেই ভাতের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল বুঝি বা সীদ্দাম্মা তাদের জন্য ভাত রাখবে না।

"সীদ্দাম্মা"! ভেঙ্কাইয়া ডাক দেয়।

"কি ?"

"না···কিছু না এমনি।"

খাওয়া দাওয়া সেরে ঠাকুরপো শুয়ে পড়ে। সীদ্দাম্মা কোলের বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ঠায় বসে থাকে।

"ভাখ খোকন, তোর বাবা আজ আসবে।" সীদ্দাম্মা বলে।

"অ্যাঁ ·····অ্যাঁ..." তার খোকন বলে।

"আমার খোকন সব বোঝে।" বলে সীদ্দাম্মা খোকনকে চুমু খায়।

সীদ্দাম্মা বাচ্চাটিকে ঘুম পাড়িয়ে রান্না ঘরে এসে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী ভাতের হাঁড়ির কাছে বসে। তাঁদের চোয়ালগুলো নড়ছে। ভাতের হাঁড়িটি ফাঁকা। সীদ্দাম্মার খুব হাসি পায়। হাসি চাপতে চেষ্টা করে, পারে না। হো হো করে হেসে ফেলে। শ্বশুর-শাশুড়ী থ মেরে বসে থাকে। তারা ভেবেছিল, বৌমার কাছে হয়ত তাদের কিছু শুনতে হবে।

পরক্ষণেই ভেঙ্কাইয়ার মনে খুব অনুতাপ এল। কারণ আর এক মুঠো ভাতও বউয়ের জন্য হাঁড়িতে নেই।

"কই আবোল-তাবোল কিছু শোনালিনাত সীদ্দাম্মা।" ভেঙ্কাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

"আজ আমি সব কিছু সহ্য করতে পারব। কাউকে কিছু বলব না।"

"কেন ?"

"বলব না।"

"হয় ব্যাপারটা খুলে বল, না হয় আমাদের কিছু শোনাও। ব্যাস, দু'টোর মধ্যে একটা।"

"নাইবা শুনলেন।"

"ভেঙ্কাম্মা ?"

"বলুন, রাজা বাহাদুর।"

"আমাদের বিয়ে হয়েছে কত বছর হল ?"

"এই বছর চল্লিশের কাছাকাছি।"

"এতখানি মন মরা অবস্থায় কোনদিন আমাকে দেখেছ ?"

"না তো।"

"না না সত্যি কথা বল।"

"বল্লাম তো, দেখিনি দেখিনি।"

অন্ধকার হয়ে আসে। সীদ্দাম্মা বাচ্চাটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর মোড়ায় কাচা শাড়িটি পরে সীনাপ্পার প্রতীক্ষায় থাকে। তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকুরপো উঁ-আঁ করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়ার আগে সে বলে, "বউদি, দাদা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলে দিও।"

সীদ্দাম্মা হেসে ফেলে।

"হাসলে যে ?"

"না এমনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আমি তোমাকে তুলে দেবখন।"

"আচ্ছা" বলে ঠাকুরপো শুয়ে পড়েছিল বটে তবে এখনও ঘুমায়নি। উঁ-আঁ করে এখনও জেগে আছে।

"বৌদি ?"

"বল ঠাকুরপো।"

"দাদার কত জন বন্ধু ?"

"তোমার দাদার বন্ধু কত জন মানে !"

"আমি কি জানি।" ঠাকুরপো বলে! "বলছেতো সবাই মিলে দেশ উদ্ধার করবে। দুর্ভিক্ষকে রুখবে।"

"সব বীর পুরুষ কি না।" সীদ্দাম্মা খুব দরদঢালা সুরে বলে।

ঠাকুরপো কথায় কথায় ঘুমিয়ে পড়ে। সীদ্দাম্মা বাইরের দিকে ঠায় চেয়ে থাকে। দূরের পাহাড়গুলো বিরাট বিরাট ছায়ামূর্তি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। ছুটে গিয়ে সীদ্দাম্মা দরজা খোলে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। ভয়ে সীদ্দাম্মা কাঁপতে থাকে। শিরে সংক্রান্তি! তার ভয় হল পাছে সীনাপ্পা ধরা পড়ে। ছলে-বলে-কৌশলে পুলিশটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব আঁটে।

"এই যে চেলাপ্পা দেখছি। কেমন আছ ?" সীদ্দাম্মা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে।

"ওঃ, তুমি সীদ্দাম্মা !"

"আজকাল তোমাকে তো দেখাই যায় না।"

"দেশে যে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, দিনরাত ডিউটিতে থাকতে হয়।"

"ওঃ—তাই নাকি। কি ব্যাপার। এত রাত্রে টহল ?"

"কেন—তাকি আর আমি জানি। ডিউটি ইজ্ ডিউটি।"

"তবু একটা কারণ তো থাকবে।"

"মানে ! কি বলতে চাও ?"

"এই এক্ষুণি তুমি যা বললে তাই।"

"আমি এখন কি বললাম ?"

পুলিশের ইচ্ছা করল তাকে সুন্দরী বলে সম্বোধন করতে। কিন্তু বলতে সাহস হয় না, অথচ কিছু না বললেও মন সায় দেয় না। কিন্তু কি যে বলবে কিছুই ঠিক করতে পারে না তবু বলা চাই। শেষে হঠাৎ "সীদ্দি" বলে ডাক দিয়ে সীদ্দাম্মার কাছে ঘেঁষে যায়।

"কি ভাই ?"

"ভাই ?"

"বউদি ভাল আছে ?"

"তার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ।"

চেলাপ্পা এই সে দিন তৃতীয় বার বিয়ে করেছে কিন্তু কোন বউয়ের উপরেই তার বিশ্বাস নেই । সবাইকে সে সন্দেহ করে ।

"না ভাই, এই যে তুমি রাত্রে টহল দিচ্ছ ওদিকেত সে একা ঘরে......" সীদ্দাম্মা আরো কিছু বলত কিন্তু হঠাৎ থামতে হল চেলাপ্পার "চুপ" বলার সঙ্গে সঙ্গে ।

"তুমিত রামাইয়ার কিট্টাপ্পাকে ভাল করেই জান ।"

"চুপ চুপ ।"

"তুমি হয়ত জান না আজ ঐ খারাপ লোকটা গাঁয়েই আছে ।"

"চুপ ! চুপ !! চুপ !!! চুপ !!!!"

"যাক, এই যথেষ্ট" সীদ্দাম্মা মনে মনে ভাবে । অন্তরালে দাঁড়িয়ে চেলাপ্পার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে । চেলাপ্পা কিছুক্ষণ টহল দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হয় । কারণ এমনি অনেকদিন ধরেই রামাইয়ার কিট্টাপ্পার উপর তার সন্দেহ ছিল, তার উপর সীদ্দাম্মার কথা শুনে ঘর সামলাতে ছুটে না গিয়ে সন্দিগ্ধ মন স্বস্তি পাচ্ছিল না ।

"বউদি ?"

"চুপ ।"

"কোথায় গেছলে তুমি ।"

"চুপ ! চুপ !!"

"একি বউদি ?"

চুপ ! চুপ !! চুপ !!! চুপ !!!!

সীদ্দাম্মা সীনাপ্পার আসার পথের দিকে ঠায় চেয়ে আছে । ঘরটা আর একবার মনের মত করে গুছিয়ে নেয় । স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি বলবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছেনা...চেহারার অবস্থা কি হয়েছে কে জানে ? আমাকে দেখে কি বলবে ! কি করবে ? আমিই বা কি করবো ! হাসব ! নাচব ! গাইব ! আনন্দে কাঁদব ! সামান্য মাত্র শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন ধড়াক করে ওঠে । সমস্ত শরীরটা কেঁপে ওঠে !

দু'একবার বাইরে গিয়েও ঘুরে আসে । ইতি মধ্যে একবার তীরের মত

ছুটে গিয়ে পাহাড়ের কাছেও ঘুরে এসেছে। তবু সীনাপ্পার দেখা পায় না সে। সেখানে গিয়ে ভাবে হয়ত বা অন্য পথে স্বামী তার ঘরে পৌঁছে গেছে। কথাটা মাথায় ঢুকতেই দ্বিগুণ জোরে হরিণের মত ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে ঘরে।

ঘরে এসে আনাচে কানাচে কত খোঁজে, তবুও স্বামীর দেখা পায় না। ঘুমন্ত বাচ্চাটা হঠাৎ উঠে পড়ে চিৎকার করে কাঁদে। সীদ্দাম্মা দুধ খাইয়ে পিট চাপড়ে চুমো খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর ঠাকুরপোকে জাগিয়ে দেয়।

'সত্যি কথা বলত ঠাকুরপো, তোমার দাদা কি আসবে?'

'আ! ভাল লাগছে না বউদি, আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'বলনা ঠাকুরপো, সে কি আসবে?'

'বললাম তো।'

'আজকেই আসার কথা ছিল তো?'

'সপ্তম দিনে···অর্থাৎ···আজকেই!···এক···দুই...তিন···চার···পাঁচ···ছয় ···সাত।'

'এখনও সে আসেনি।'

'প্রতিক্ষায় থাক আসবে।'

'এখন পর্য্যন্ততো তাই করে আসছি।'

'দাদা বলেছিল—আসার আগে পাহাড়ের ওপরে প্রদীপ জ্বালাবে।'

'প্রদীপ'

'হ্যাঁ, প্রদীপ।'

'ইস, কি একেবারে রাজা বাহাদুর।" সীদ্দাম্মা খুব দরদঢালা সুরে বলে।

'একেবারে ব্যোম ভালানাথ!'

সীদ্দাম্মা এবং তার ঠাকুরপো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ সেখানে থাকে। কিন্তু পাহাড় সেই নিশুতি রাতের অন্ধকারে কাল মেঘের টুকরোর মত দেখাচ্ছে। পাহাড়ের কোলে বা শীর্ষদেশে কোন প্রদীপ শিখা দেখা যায়নি।

'প্রদীপ নিভে যায়নি তো?' সীদ্দাম্মা জিজ্ঞাসা করে।

'না।...' ঠাকুরপো বলে।

'প্রদীপ বাইরের অত ঠাণ্ডা হাওয়ায় জ্বলবে কি করে?'

'হাওয়া আছে বটে...,

সীদ্দাম্মা অনেকক্ষণ ধরে সে দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্লান্তি আসে তার দেহে। অজানিত কারণে তার চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। সেই পুরানো গানের পুনরাবৃত্তি করে :

'তুষের আগুন ঘুষিয়া জ্বলে গো—
সেই ভাবনা জ্বলে, আমার গো প্রাণ
কোন বা দেশে রইলারে সোনার চাঁন'।

হঠাৎ ঠাকুরপো চিৎকার করে বলে ওঠে, "বউদি, ঐদেখ।"

"কি ঠাকুরপো?"

"পাহাড়ে ঐ প্রদীপ শিখা।"

সীদ্দাম্মা খুব কৌতুহলের সঙ্গে পাহাড়ের দিকে তাকায়। "হ্যাঁ, সত্যিতো পাহাড়ের উপর প্রদীপ জ্বলছে।" সীদ্দাম্মার এখন আর কোন গান মনে পড়ে না।

"ঠাকুরপো!"

"কি বউদি?"

"প্রদীপটাকে এদিক ওদিক নাড়াচ্ছে কেন?"

"দাদা বলছে যে আমি আসছি, আসছি।"

'ইস্ উনি আসছেন। ওনার আসাটা যেন আসা নয়, আগমন। একেবারে রাজা বাহাদুর কিনা।' সীদ্দাম্মা খুব দরদ-ঢালা সুরে বলে। পায়ের পাতার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে, উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ পাহাড়ের বুকে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে আসে। সীদ্দাম্মার মন যেন একেবারে দমে যায়।

ওঁয়া—ওঁয়া করে তার বাচ্চা ছেলেটি কাঁদে। সীদ্দাম্মা ছুটে এসে বাচ্চাটিকে কোলে জড়িয়ে নেয়।

"ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!" সীদ্দাম্মা খুব ঘাবড়ে-যাওয়া সুরে ডাক দেয়।

"কি বউদি ?"

"পাহাড়ের সেই প্রদীপ শিখাটি··· ।"

"তাইতো নিভে গেছে দেখছি !"

"তাহলে ··তোমার দাদা !"

কোলে বাচ্চাটি আবার গোঙাতে সুরু করে।

আবার পাহাড়ের বুক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসে। তৎক্ষণাৎ ঠাকুরপো বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় সেই পাহাড়ের দিকে।

সীদ্দাম্মা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না। বিস্ফারিত চোখে, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

"চুপ কর বাবা, চুপ কর। আর কাঁদিসনে।"

শ্বশুর, শাশুড়ী চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়ায়। সীদ্দাম্মার সাথে কথা বলার সাহস যেন পায় না। শ্বশুর, ভেঙ্কাম্মার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করে।

"ভেকাম্মা ?"

"কি।"

"দেখত।"

"কি দেখব ?"

"সেই আওয়াজটা যেন কেথেকে আসছে ?"

"কোন আওয়াজটা ?"

"এক্ষুনি যেটা ওদিক দিয়ে আসছে।"

"ঐটা।"

"হ্যাঁ, ঐটা।"

"বলবো ?"

"বলনা।"

"কাছে এস, কানে কানে বলছি।"

"কি বলবে ?" বলে ভেঙ্কাইয়া বউয়ের মুখের কাছে কান পাতে।

"সেই আওয়াজ··· ।"

"আরে বলনা তাড়াতাড়ি।"

"সেই আওয়াজ।"

"তোমার এইটাই আমার ভাল লাগে না, বলনা তাড়াতাড়ি।'

"তাহলে বলবনা যাও।"

পাহাড়ের বুক থেকে আবার গুলিবর্ষণের আওয়াজ আসে। একবার দু'বার নয়, ছ' ছ'বার আওয়াজ আসে! সীদ্দাম্মার চোখ যেন অগ্নিবর্ষী। সীনাপ্পার কি হয়েছে কে জানে! ঠাকুরপো কোথায় গেছে তাও যে অজানা। হঠাৎ বাচ্চাকে কোলে জাপ্‌টে ধরে সীদ্দাম্মা পাহাড়ের দিকে ধেয়ে যায়।

'ভেঙ্কাম্মা'—ভেঙ্কাইয়া ডাক দেয়।

'কি ?'

'এক্ষুণি তো এক পশলা গুলিবর্ষণের আওয়াজ এসেছে। শুন্‌তে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তুমি কিছু বুঝতে পারছ ? ঐ আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে।'

'কিছু কেন। সব কিছুই বুঝতে পারছি।'

'তুমি যদি এতই জান, তাহলে বল কোত্থেকে এসেছে ?'

'সেই বদমায়েশরাই গুলি চালিয়েছে।'

ভেঙ্কাইয়া ঠিক বুঝতে পারেনি। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার জিজ্ঞাসা করে 'দেখলে ?'

'কি দেখব।?'

'সেই শাকপাতা তোমার কাছে কত আদরের।'

'তহশীলদার রামাইয়ার জন্য।'

'অঃ—তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ—তাই।'

ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে একজন পুলিশ আসে। পুলিশকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়ী এক কোণে সঙ্কুচিত হয়ে বসে পড়ে। পুলিশের কাঁধে বন্দুক, মাথায় টুপি। চোখ অগ্নিবর্ষী। 'ভেতরে কে আছে ?' ঘরে পা রেখে সে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে।

'খিরকী আছে।' ভেঙ্কাইয়া বলে।

'না ·· না ·· সব অন্ধকার ঠেকছে' ভেঙ্কাম্মা বলে।

'যাই হোক' ভেঙ্কাইয়া বলে।

'তোমরাইতো সীনাপ্পার মা, বাপ ?' পুলিশ জিজ্ঞাসা করে।

'লোকটা কি জিজ্ঞাসা করছে, ভেঙ্কাম্মা।'

"আমি কি জানি।"

'বলছ না কেন ?' সিপাই কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ।

'কি বলতে হবে ?' ভেঙ্কাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের খুব রাগ হয়। কাঁধের বন্দুকটা নীচে রেখে দেয়। মাথার টুপিটা নীচে ফেলে দেয়। তার চোখ তখনও যেন অগ্নিবর্ষী।

'তোমরাই কি সীনাপ্পার বাবা, মা ?' পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে।

ভেঙ্কাম্মার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়।

'শুনছ।'

'কি ?' ভেঙ্কাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

'আমাদের ছেলে সীনাপ্পা…।' 'ভেঙ্কাম্মার মুখে আর কোন কথা সরেনি। ভেঙ্কাইয়ার গলা জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। ভেঙ্কাইয়া কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

''একি করছ ?"

'সীনাপ্পা গুলি খেয়েছে।'

'এঁ্যা।'

'সীনাপ্পার ভাইও।'

'এঁ্যা ?'

'সীদ্দাম্মাও।'

'তাই নাকি !' ভেঙ্কাইয়ার মুখে আর কোন কথা সরেনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঠায় পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে। তার দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

'তোমাদেরও এরেষ্ট করছি। —পুলিশ বলে।

ভেঙ্কাম্মা—'আঁ—আঁ, করে ওঠে।

'একি ভাল হচ্ছে ?' ভেঙ্কাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

'সীস্তি' ভেঙ্কাম্মা বলে।

'চল, চল !' বলে পুলিশ হাতে তুলে নেয় বন্দুক, মাথায় পরে টুপি। তারপর

রক্তচক্ষু করে বন্দুক দিয়ে কয়েক ঘা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠতে শুরু করে। দেহটা কাট হয়ে আসছে। গোঙানি আর আর্তনাদ থেমে আসছে। আঘাত লাগা সিঁদুরে লাল জায়গাটা ক্রমশ নীল হচ্ছে।



কেরাণীর জীবন

—বনশ্রী—

"শুনছ, কথা দাও, আজ সকাল সকাল ফিরবে?"—ঘর থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে পার্বতী বলে।

চটি জুতোয় পা ঢোকাতে ঢোকাতে বিশ্বনাথ স্ত্রীর দিকে তাকায়। স্বামীর দিকে স্ত্রী অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

এ এক অদ্ভুত ধরনের বউ। জিজ্ঞেস করছে আজকে অন্ততঃ সকাল সকাল ফিরবো কি না, যেন রোজ ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরি। নিজের খেয়াল খুশিমত সব কিছু চিন্তা করে প্রত্যেকটা বিষয়ে। অফিসের খুঁটিনাটি খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। কোন কিছু বোঝার কিছু মাত্র চেষ্টা করে না। ঐ ধরনের বউ শত্রুর ভাগ্যেও যেন ভগবান না জোটায়। নিজের দুঃখের কথা বিশ্বনাথ আর কা'কে শোনাবে।

পার্বতী আবার বলে—'কি জবাব দিচ্ছ না যে, একদিকে ছেলের কাসি, অন্যদিকে মেয়ে আজ ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। আমি ঘরে সারাদিন জ্বলে-পুড়ে মরছি এদের জ্বালায়। আর তুমি রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত ফেরার নামটি করতে চাও না। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল ছিল।' পার্বতীর চোখের জল চিক্‌চিক্ করতে লাগল। এ তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘষা গ্রামফোনের রেকর্ডের মত প্রত্যেকদিন ঘ্যান ঘ্যান করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যায়। প্রথমে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করা, তারপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত হাউমাউ করে কাঁদা, আর তার পরক্ষণেই চোখের জল মুছে নেওয়া……এটাই তার প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা কাজ। সাত বছর ধরে বিশ্বনাথ জীবনে এই দেখে আসছে।

এও কি একটা জীবন। প্রত্যেকদিনের এই বককবকানি আর প্যান প্যান কান্না বিশ্বনাথ আর কতদিন সহ্য করবে। জীবনের অর্থ ত শুধু এই দৈনন্দিন জীবনের কান্নাই নয়। শেষ পর্যন্ত……

ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বিশ্বনাথ প্রথম ডিভিসানে পাশ করেছিল। কিন্তু চাকরী পেল ঠিক অন্য ধরনের। সব লেখাপড়া যেন অর্থহীন হয়ে গেল। সে এখন পর্যন্ত ঠিক করতেই পারল না বাঁচার প্রয়োজনই বা কি, তার জীবনের সার্থকতাই বা কোথায়—এই প্রশ্নটা সব সময় তার সামনে থাকত।

বিশ্বনাথ জীবন দর্শন সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলো। সহজ সরল মানুষ। পার্বতী গুমরে পড়ে দুঃখে কণ্ঠরুদ্ধ করার প্রয়াস না পেয়েই বলতে শুরু করে, 'আমার আর আমার ছেলেপুলেদের চিন্তা কারো থাকবে কেন? আমরা সব জাহান্নামে গেলেও কেউ জিজ্ঞেস করার লোক নেই।'…আর বাকী কথাগুলো কান্নাতেই মিলিয়ে গেল…।

পার্বতীর এই কথাগুলো বিশ্বনাথের কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে বাজত। বাচ্চাগুলো কি একা পার্বতীর? তারই বাচ্চা! সে কি তাদের কেউ নয়! কথাগুলো অনেকক্ষণ বাজলেও সে ওসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাত না। অতবেশী চিন্তা করলে অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত।

পার্বতীর একেবারে কান্না আর কান্না! এর সারাটি জীবন দেখছি কেঁদে কেঁদেই কাটবে। ওর জন্মের আগে থেকেই যেন দুঃখটা পৃথিবীতে এসে তৈরী হয়েছিল ওর জন্যে। এই ঘরের দরজা, ছাদ সব কিছু যেন একদিন না একদিন এই সমস্যার ভারে ভেঙ্গে চুরে ধ্বসে পড়বে। এ ধ্বস যেন শুরু হয়েছে, এখন তারা টের পাচ্ছে না। পার্বতী অতীতের কথা ভেবে কাঁদে; আগামী দিনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে যায়।

এত ঝামেলা পোয়াতে হবে! এর কি কোন সুরাহা হবে না। বিশ্বনাথ দুই হাত নিজের কপালে রেখে দাঁড়িয়ে পরে অগ্রসর হয়।

পার্বতী কান্নায় ফেটে পড়তে চায়। উচ্চস্বরে বলে, 'বলি আমার কথা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ না?' পার্বতীর কান্না হাওয়ায় মিলিয়ে অলিগলি দিয়ে বেরিয়ে সারা আকাশে মিলিয়ে যায়।

বিশ্বনাথ পার্বতীর দিকে ঘুরে বলে, 'ছিঃ! চুপ কর! সব সময় তোমার কান্না লেগেই আছে। অফিসের কাজ সেরেই আমি সোজা বাড়ী ফিরব। খুব তাড়াতাড়িই ফিরব, হয়েছে? এবার চুপ কর।'

আঁচল দিয়ে পার্বতী চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'ফেরার পথে ডাক্তারের কাছ থেকে

ছেলেটার জন্যে অষুধ নিয়ে এস।' এর পরেই তার চোখের জল যেন জ্যৈষ্ঠমাসের ছোট পুকুরের মত শুকিয়ে যায়।

'আগের অষুধটা কি ফুরিয়ে গেছে?'

'সে অষুধটাত কদ্দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাল কথা, ঘরে কফি আর চিনিও নেই।'

বিশ্বনাথ 'আচ্ছা' বলে ঘরের বাইরে পা বাড়ায়।

পার্বতী স্বামীর পেছনে পেছনে যেতে যেতে বলে, "মেয়েটি কিছু খায় না। গ্লুকোজ আর গোটা কয়েক আঙ্গুর নিয়ে এস। হয়ত ফলের রস পেটে যাবে।"

ঠিক সেই সময় ধোয়া কাপড় কাঁধে ফেলে বিশ্বনাথের মা সেদিকে এসে বলে, "ও বিশু, ঘরে যে ডাল তেঁতুল, আর পেঁয়াজ নেই বাবা। সন্ধ্যার সময় ফেরার পথে এগুলো ভুলিসনি, বাবা।"

বিশ্বনাথ মিনিটখানেক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। পেছনের দিকে তাকানোর সাহস যেন সে পাচ্ছে না। সামনের পথের দিকে চেয়ে রইল। স্ত্রী আবার বলে, "ফেরার পথে বাজার থেকে কিছু শাকপাতাও নিয়ে এস। ঘরে তরিতরকারী বলতে কিছু নেই।"

তারপর আবার মা বলে,—"দেখ্ বাবা বাজারে গেলে ডজন দুয়েক নেবু নিশ্চয় নিয়ে আসিস। ঘরে হাজার খুঁজলেও এতটুকু আচারও পাওয়া যাবে না। একটু আচার বানিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে।"

বড়ছেলে প্রসাদ ছুটতে ছুটতে এসে বলে, "বাবা, আমার জন্য একটা পেন্সিল আর একটা জ্যামিতির বাক্স আনবে না? মাষ্টার মশাই প্রত্যেক দিন আমাকে বকুনি দেন। কতদিন তুমি আনবে বলে কথা দিলে, আনলে না।"

"ওরে বিশু দশ দিন ধরে বলব বলব করেও বলা হচ্ছে না। আমার থান ধুতিটা দুদিনেই খুব নোংরা হয়ে যাচ্ছে। ভরিটাক কাল বা বেগুনি রং নিয়ে আসবি।" তার মা বলে।

স্ত্রী : ওগো শুনছ……

ছেলে : বাবা—বাবা……

মা : ওরে বিশু……

বিশ্বনাথ ঐ তিনজনেরই সম্পূর্ণ কথাটা শুনতে পারেনি। রোজ শুনতে শুনতে

কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ওদের কথায় অত কান দিলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। বউ, ছেলে আর বুড়িমার কাঁড়ি কাঁড়ি দাবি জমা হয়ে আছে তার মনে। সেগুলো মনে পড়লেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। মাথায় যেন পোকা ঘুর ঘুর করে। রোদ চড়চড় করে উঠছে। গাছে একটি পাতাও নড়ছে না। সারাটি শরীর ঘামে ভিজে গেছে। পথে চলতে থাকা পীচ চট্ চট্ করে লাগছে চটি জুতোয়। ঘর থেকে অফিস মাইল কয়েক দূরে। হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তার পক্ষে।

বিশ্বনাথ খুব জোরে জোরে পথ হাঁটছে। ফোর্ড কোম্পানীর নতুন ট্যাক্সি তার পাশ দিয়ে সোঁ করে ছুটে গেল। একটা লরী প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করতে করতে তাকে পেছন ফেলে গেল। সামনে থাকা এক গরুর গাড়ী অত বোঝা টানতে না পারায় চাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে যেন আর্তনাদ করছে।

বিশ্বনাথের মন এখন সত্যসন্ধানী। এই জীবনের সার্থকতা কি! এই ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাই বা কি!

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য জানার জন্যে গভীর ভাবে নিবিষ্ট মন হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলো। সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

'বাপ্ রে! সাড়ে দশটা!' শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গের সময় যেমন চারদিক থেকে একটা আওয়াজ ওঠে ঠিক তেমনি বিশ্বনাথের মনের সব দিক থেকে যেন একটা গুঞ্জন ওঠে।

দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখানেই সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এখনও আরও এক মাইল হাঁটতে হবে। বিশ্বনাথের সামনের পথটাকে বিরাট এক সাপের মত মনে হল। সময় যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অফিসে পৌঁছাতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট আরও লাগবে। লেট!, লেট!! ইউ আর অলওয়েজ লেট। আই ক্যান্ট টলারেট ইট……অফিসার এমন ভাবে চিৎকার করে। ঠিক যেমনটি করে মানুষ দেখে বাঘ। সে চিৎকার যেন পাশবিক অত্যাচারের একটা আত্মসন্তুষ্টির আমেজ।

বিশ্বনাথ খুব জোরে অফিসের দিকে ছুটতে সুরু করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে।

তিন দিন লেট করলে একদিন ছুটি হিসাবে কাটা যায়। একদিন কাটা গেলে

পরের মাসের মাইনেতে তিন টাকা চার আনা কমে যায়। তার উপরে আছে এক্সপ্লানেশন ইত্যাদি। তার বুক ভয়ে টিপ টিপ করতে থাকে। ঘামে একেবারে ভিজে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে ঢোকে।

পথে যা ভেবেছিল তাই হল। ইতিমধ্যে অফিসার দুবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যার আসতে সামান্য মাত্র দেরী হয় তাকেই ডেকে পাঠান বারে বারে।

"বাবু, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।" বিশ্বনাথ নিজের চেয়ারে বসতে না বসতেই চাপরাসী এসে বলে যায়।

বিশ্বনাথের মনে আশঙ্কা মিশ্রিত ভয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকম্পিত পায়ে দুরু দুরু বুকে অফিসারের ঘরে ঢোকে।

অফিসার জিজ্ঞেস করেন,—"দেরী হল কেন?"

বিশ্বনাথ বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে আমতা আমতা করে বলে, "আজ্ঞে দেরী হয়ে গেছে স্যার।"

"হয়ে গেছে তাতো আমিও বুঝতে পারছি! কিন্তু হল কেন?" বিশ্বনাথকে বেশ কিছুক্ষণ নিরুত্তর দেখে বলেন, "মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই। আমি এই দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করছি।"

বিশ্বনাথ কি উত্তর দেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। ছিঃ! জীবনটাই যেন বৃথা। মানুষের আত্মসম্মানই যখন থাকে না তখন আর থাকে কি? চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে পারলে কত ভাল হত। কিন্তু তা যে হওয়ার নয়। যা না হওয়ার তা হবে কি করে!

অফিসার আবার চিৎকার করে ওঠেন, "তালগাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছ কেন। কথার জবাব তো একটা দেবে, না কি? দেরী হল কেন?"

"আজ্ঞে···বাড়ীতে জরুরী একটা কাজ ছিল তাই... ।"

"জরুরী কাজতো সকলেরই থাকে, আমারও থাকে। কিন্তু তাই বলে ত চাকরীতে ফাঁকি দিলে চলে না। ···যাক ক্যাশটা ঠিক মিলিয়ে রাখ! আজ উনত্রিশ তারিখ, আশা করি তা মনে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তা আছে। সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছি।" হাত কচ্লাতে কচ্লাতে বিশ্বনাথ উত্তর দিয়ে অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের সিটে বসে।

বিশ্বনাথের মনে হল যেন বাঘের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কপালে জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নেয়।

ফিলসফির গ্রাজুয়েট হয়েও বিশ্বনাথকে করতে হয় সাবট্রেজারী অফিসের ক্যাশ সেক্সনের কেরাণীগিরি। তা'ও আবার বছর চারেক লোয়ার ডিভিসানে কেরাণীগিরির ঘানি টানার পর জুটলো কপালে। এর জন্যে ম্যাট্রিক পাশ করা লোকই যথেষ্ট। কিন্তু এমন যুগ পড়েছে যে গ্রাজুয়েটের পক্ষে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোন কাজই অপমানজনক নয়। অন্য কোন ভাল চাকরী পেলে ঐ কাজে ইস্তফা দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু ভাল চাকরী ত দূরের কথা, গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা তাকে যেন বলে দিল, যে চাকরীতে বর্তমানে আছ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। দলে দলে লোক যখন একই খপ্পরে পড়ে জীবন-যাপন করছে, তখন নিজেকে পৃথক করে বিচার করার স্বার্থকতাই বা কি। ব্যক্তির বিকাশ এ সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এই কথাকে মনে রেখেই কর্তব্য স্থির করা উচিত। আসলে সে নিজে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে জীবন সমস্যা নিয়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যান্ত করেও একাজ উঠতে পারে না সেরে। অঙ্কের নাম করলে তার গা কেঁপে জ্বর আসত।

ফিলসফির ছাত্রের পক্ষে অঙ্ক শাস্ত্রের ব্যাপারে জ্বর আসা স্বাভাবিক বৈ কি!

বিশ্বনাথ নিজের জায়গায় বসল বটে তবে তার মনটি ডুবেছিল জীবন দর্শনে আর জীবনের মূল্যায়নে। গাদাগাদা কাগজ, মোটা মোটা ফাইল ছিল সামনে পড়ে।

চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকলে অফিসের কাজে ভীষণ ক্ষতি হবে। আবার কাজে হাত দিয়েও এক মনে কাজ করা যাবে না। চিন্তা-ভাবনাগুলো তোলপাড় করবে তার মাথায়। সত্যি কথা বলতে বিগত সাত বছর ধরে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সে শুধু চিন্তা করেই এসেছে, কিনারা করতে পারেনি। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—প্রশ্নটা বারে বারে জেগেছে তার মনে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে তাকে।

"বাবু, সাহেব ডাকছেন। চাপরাসী বিশ্বনাথকে বলে যায়। বিশ্বনাথ ঘড়ির দিকে তাকায়। পৌণে পাঁচটা বেজে গেছে! কাজ এখনও অনেক বাকী। বুক কাঁপতে লাগলো। আস্তে আস্তে উঠে অফিসারের ঘরে ঢুকল।

অফিসার জিজ্ঞেস করেন, 'হিসেবের কাজ সব হয়েছে ?'

ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথ বলে, "আজ্ঞে হচ্ছে। সামান্যমাত্র বাকী।"

"আরে তুমি ত আচ্ছা লোক দেখছি। তোমাকে দিয়ে কোন কাজ আর সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি কতদিন তোমাকে বুঝিয়েছি যে, ঠিক সময়ে অফিসে এসে পদ্ধতি মাফিক কাজ কর। —না, তুমি দেখছি কথায় বদলান লোক নও।"

বিশ্বনাথের মনে কথাগুলো তীরের মত গিয়ে বিঁধলো : সে কাজ করার পদ্ধতি জানে না ! কথায় বদলানো লোক সে নয় !

শেষ পর্যন্ত অফিসার খুব ডাটের সঙ্গে হুকুম দিলেন, 'সারারাত বসে থাক, কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরবে ! বুঝলে ? সমস্ত হিসাবনিকাশ কাল অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখবো ! যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

বিশ্বনাথ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আজ ঘরে একটা জরুরী কাজ আছে স্যার, বাচ্চাটার শরীর ভাল নয়। কাল সকাল সকাল এসে সব কাজ ঠিক করে দেব।'

অফিসার খুব জোরে চিৎকার করে বলেন, 'চুপ করো। আগে নিজের জায়গায় বসে কাজ শেষ কর। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার ওসব বায়নাগুলো রেখে দাও, ওসব আমি বুঝি। কাল তিরিশ তারিখ। যাও !' নিজেরা কত রবি জ্বলেরে, কেবা আঁখি মেলেরে—ভাব নিয়ে থাকলেও খাটিয়ে নেবার বেলায় ষোল আনা। বিশ্বনাথ নিশ্চুপে এসে নিজের চেয়ারে বসে কাজে হাত দিল। ওরা মরলে বিশ্বনাথ যেন হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বাঁচে। সন্ধ্যা ছটা বেজে গেল। অফিসে দু'একজন বড়বাবু ছাড়া আর কেউ নেই। চাপরাসী সুইচ টিপে চলে যায়।

বিশ্বনাথ রেজিষ্টার খুলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু তার মনে নানা চিন্তা-ভাবনা এসে তোলপাড় করে। ঐ মূর্খ অফিসারটা তাকে জানোয়ারের পর্যায়ে ফেলেছে ! ঠিকই। ঠিকই বলছে। সত্যি মানুষ হলে এই গাধার খাটুনি করব কেন ? ছিঃ ! কি বিশ্রী জীবন ! এই জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা অনেক ভাল।

আজকেও ঘরে যেতে যেতে আবার ন'টা বাজবে। পার্বতীর কান্না শুনতে হবে। মায়ের বকুনি খেতে হবে। বাচ্চা মেয়েটির কি হবে ! আমার ফিরতে না ফিরতে ডাক্তার চলে যাবে। ঘর থেকে বেরুনোর সময় পার্বতী কি সব

জরুরী জিনিষ যেন আনতে বলছিল। কফি, গ্লুকোজ, চিনি...ওরা কেউ জানে না যে আমার পকেটে আজ কানাকড়িও নেই। আবার সেগুলো না নিয়ে গেলে··· ভাবতে ভাবতে বিশ্বনাথের মাথা ঘোরে।

অফিসের ঘড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার মন পাখনা মেলে উড়তে চায়। তাড়াহুড়ো করে কাগজপত্তর ফাইল-খাতা সব যথাস্থানে রেখে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়।

মেজাজটা তার খুব বিগড়ে আছে। বাড়ীর দিকে এগোচ্ছে। সারাটি রাস্তা বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে ওসব যেন তার চোখে, মুখে বিঁধছে। বিশ্বনাথের মনে বিভিন্ন চিন্তা বারে বারে মস্তিষ্কের ত্রিসীমানায় এসে আছড়ে পড়েছে প্রতি মুহূর্তে।

লোকটা খুব নীচ। এতখানি সাহস কোত্থেকে পেল। আমাকে বলে কিনা মানুষ নই। বদমাইস। আমার জীবনের দাম ঠিক করে দেবে সে! আমার মত লোককে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে। এই অফিসটা যেন একটা যমালয়, আর ঐ অফিসারটি যেন স্বয়ং যম!

সামনে থেকে আসতে থাকা লরীর তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল বিশ্বনাথ। ফুটপাত ধরে এবার চলতে শুরু করে। ঘরের কাছাকাছি আসতে তার মাথা আরও গরম হয়ে যায়। এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখের সামনে নেবে আসে। এক নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে যেন অন্যটাতে ঢুকছে। সারা জীবন ধরে যদি সে এই পথে চলতে পারত তা হলে মন্দ হত না। পরলোকে যদি এই পথ নিয়ে যেতে পারত আরো ভাল হত। সেখানে আলো আছে, হাসি আছে, আর আছে বিশ্রাম। ...চিরবিশ্রাম · বিশেষ করে মানসিক বিশ্রাম।

প্রত্যেক দিনের মত বিশ্বনাথের পা ঘরের কাছে এসে থেমে গেল। এখন পর্য্যন্ত সে অলৌকিক কল্পনারাজ্যে বিচরণ করছিল। এখন যেন হঠাৎ মাটিতে নাবতে হল।

ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আঙ্গিনায় তার প্রতীক্ষায় পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতীকে কিছু বলার মত সুযোগ না দিয়ে সোজা সে ঘরের ভেতরে ঢোকে।

সেদিন অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিশ্বনাথ ঘুমোতে পারেনি। এপাশ-ওপাশ করে

সারা রাত কাটিয়ে দেয়। মনটা খুব ছটপট করছিল। বিভিন্ন ঘটনার ছবি ভাসছে চোখের সামনে। নানা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে কিছুতেই সে নিস্তার পাচ্ছে না। উঠে বসে হারিকেন ধরিয়ে গীতার পাতা ওল্টাতে লাগল, মনে মনে ইচ্ছা ভগবান যেন কিছু উপর থেকে বলেন। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। গীতা বন্ধ করে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখতে সুরু করে। কাগজটা পুরানো। তা সত্বেও যেন আর একবার পড়ে নিচ্ছে। এতে কোন বিরক্তি লাগছে না।

কাগজের এক জায়গায় লেখা ছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী য়ুরোপ বেড়াতে যাবেন। বিশ্বশান্তির পক্ষে নেহরুর নীতি ভারতকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করেছে।...

বিশ্বনাথ আবার ভাবতে সুরু করে। শ্রীনেহরু অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি নিজের ঘরেই শান্তি আনতে পারছি না। অফিসে যেন এক আগ্নেয়গিরি আর ঘর যেন এক অশান্ত মহাসমুদ্র। আর কোথায় শান্তি পাব! জীবনটা কোথায় শেষ হবে! ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে উড়তে থাকা শুকনো পাতার মত আমি যেন উড়ে যাচ্ছি। আমি জানি না আমি কোথায়!

বিশ্বনাথ মাথা তুলে উপরের দিকে তাকায়। মাথার উপর শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি ছিল। মূর্তিটা কত শান্ত দেখাচ্ছে। এর মুখমণ্ডল কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কত অদ্ভুত আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার জীবন কত তুচ্ছ। এই জ্যোতি আমার মুখে নেই কেন? রাজপ্রাসাদের সমস্ত রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস বেশে বেরিয়ে পড়লেন, দশজনের উপকারে তপস্যা করলেন। আজ অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। সে রামও নেই—অযোধ্যাও নেই। সত্যম্ শিব সুন্দরম্—ভারতের একমাত্র আদর্শ ছিল। আজ এ সবের দাম নেই।

এই ঘরে এক মিনিটের জন্যেও শান্তি পাই না। এখানে সব সময় কান্না-মুখে আছে স্ত্রী। বাচ্চাদের ট্যাঁ ট্যাঁ লেগে আছে। বক বক করতে-থাকা মা আছে। এইটাই আজকের অবস্থা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলুর বলদের মত ঘানি টেনে মর। বাঘের মত গর্জে ওঠা অফিসারদের বকুনি খাও, আর সমস্ত কিছু ভুলে যান্ত্রিক ভাবে জীবন-যাপন কর।

তিরিশদিন খাট, আর মাসান্তে একশো টাকা নিয়ে পথ দেখ···এই তপস্যার ফল। ছাইপাশ দিয়ে পেট ভরানোর তপস্যা।

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি। বিশ্বনাথ বিছানা ছেড়ে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করে।··· অনেকক্ষণ সে ঐভাবেই থাকে। তারপর অবশ হয়ে গিয়ে ঐ ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে।···

কোঁক্কোর্ কোঁ······

*

মুরগীর ডাক শুনেই বিশ্বনাথ লাফিয়ে ওঠে তাড়াহুড়ো করে। নিজের কিছু জামা কাপড় একটা ব্যাগে পুরে নেয়। কাছেই বৌ ঘুমিয়ে। ঘুমন্ত বৌটার মুখ শেষবারের মত ভাল করে দেখে নিল। কোলে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে সে যেন সবকিছু ভুলে আছে। মায়ের দিকেও কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দরজার বাইরে গিয়ে সে আবার সকলের দিকে তাকায়। তার চোখ ছল্ ছল্ করছে। বেরিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।···

কাশী, প্রয়াগ, বদ্রিনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থক্ষেত্রগুলো ঘুরেও তার মনে শান্তি এলোনা। বদ্রিনাথ থেকে ফেরার পথে এক বটগাছ দেখতে পায়। তার মন শান্তি পেতে চায়। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে শান্তি।

খুক্ খুক্ : ছেলে কাসছে···

বাবা! বাবা! স্বপ্নে বাচ্চা মেয়েটির চিৎকার! বড়ছেলে প্রসাদের কণ্ঠ— বাবা জ্যামিতির বাক্সটা···

বিশ্বনাথের তপস্যা ভেঙ্গে গেল! খেই হারিয়ে হিমালয়ের পাদদেশের বটগাছের তলায় পড়ে থাকা বিশ্বনাথের মন ছুটে ফিরে এলো তার ঘরে। নিজের দিকে তাকিয়ে সে যেন লজ্জা পেল।

স্বপ্ন দেখছিল বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ মাঝের ঘরে ঢুকলো। কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে মেয়েটা "বাবা, বাবা" বলে চিৎকার করছে। সে ছুটে গিয়ে তার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "মা ভয় পাসনি, আমি এখানেই আছি।"

পার্ব্বতীও স্বপ্নে বিড় বিড় করে বলছে, "শুনছ, কথা দাও আজ অন্ততঃ সকাল সকাল ফিরবে।"

বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "ফিরব আজ, ঠিক ফিরব।"

কথাটি বলে পেছনের দিকে ঘুরে পার্ব্বতীর দিকে সে তাকায়। পার্ব্বতী ঘুমিয়ে আছে। আমার কথা শুনে কি আর সে উত্তর দেবে। তারপর সে চলে যায় নিজের ঘরে। চিন্তা করে—বউ, ছেলে, 'মার কথা। এদিকে পার্ব্বতী উঠে পড়ে।

তাইত!...আমি ঘর ছেড়ে চলে গেলে, এরা বাঁচবে কি করে! কাল থেকেইতো এদের ক্ষিদের জ্বালায় ছটপট করে মরতে হবে। পার্ব্বতীর হাতে কানাকড়িও নেই! সে বেচারী এদের কি ভাবে লালন পালন করবে।

তারপর আবার বিশ্বনাথ ঘুমিয়ে পড়ে। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সাত সকালে স্ত্রী ঝগড়া করছে দুধওয়ালীর সঙ্গে। ওদের চিংকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল বিশ্বনাথের। সোয়া আটটা বেজে গেছে। আজ তিরিশ তারিখ। তাড়াতাড়ি সমস্ত হিসাবনিকাশ ঠিকঠাক করে অফিসারকে না দেখালে গালমন্দ শুনতে হবে। বিশ্বনাথ তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে নাকেমুখে চারটে ভাত গুঁজে অফিসের দিকে রওনা হল। অফিসে বেরোবার মুখেই স্বামীকে প্রত্যেকদিনের মত সে দিনও পার্ব্বতী বলে, "শুনছ, কথা দাও আজ সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরবে।"

বিশ্বনাথ মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে।

"সাড়া দিচ্ছ না কেন? কালকেও বাচ্চা মেয়েটার জন্যে অষুধ আননি। বাচ্চাটার কাসি দিনকে দিন বাড়ছে। কই কিছু বলছ না যে! আমার কথা কি তুমি শুনতে পাচ্ছো না? ঘরকরনার ব্যাপারে তুমি কিছু বলনা কেন বলতে পার? সব কিছু কি আমাকেই"...বিশ্বনাথ নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ কোন উত্তর না পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে সুরু করে স্ত্রী। এই কান্নাতো পার্ব্বতীর অলিখিত রোজনামচার প্রতিটি পাতায় আছে। প্রথমে চটে যাওয়া, তারপরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দেওয়া। "ছিঃ। এ কিসের জীবন! মনের শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। অফিসে বসে আমি কাজ করব কি করে?"

তার মা বলে, "ওরে বিশু! সে জিনিসগুলো কালকেও ভুলে গেছিস। আজ যেন ভুলে যাসনি।"

বড় ছেলে প্রসাদ নিজের দাবীকে পুনরাবৃত্তি করে বলে, 'বাবা, জ্যামিতির বাক্সটা...মাষ্টার মশায় রোজ ..'

বিশ্বনাথ কানে আঙুল দিয়ে বাইরে যেন ছুটে বেরিয়ে যায়। ঐ বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে থেকে পার্বতীর কান্নার আওয়াজ যেন কালনাগিনীর মত বিশ্বনাথকে ধাওয়া করছে তার অফিস পর্যন্ত। আর সে ছুটে চলেছে প্রাণপন। ছুটতে ছুটতে ভাবতে শুরু করে এ ছোটাছুটির শেষ হবে কবে। এর শেষ কোথায়? সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। তার মস্তিষ্কে হাজারো চিন্তা এসে আছড়ে পড়ছে। এ যেন ঝড়ো রাতের মহাসমুদ্রের গর্জন।

বিশ্বনাথ অফিসে পা রাখে। অফিস নয়ত এ যেন এক বিরাট মেসিন। আর সে যেন তারই এক অংশ।

কাল পয়লা তারিখ। এই দিন সকলের কাছে আনে একদিনের সুখ-সমৃদ্ধি। এই পয়লা তারিখেই তার জন্মদিন, কিন্তু সেই দিনও তাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। হাজার হাজার টাকা নিজের হাতে সবাইকে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু সে নিজে তা থেকে পেতে পারে মাত্র একশ। যা পাবে তার বেশীর ভাগই বাড়ী ফেরার সময় পাওনাদারদের দিতে হবে। এই পবিত্র কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রতি মাসে, বারে বারে।

চাপরাশী এসে বিশ্বনাথকে বলে, "বাবু রাত আটটা বেজে গেছে।"

"আটটা বেজে গেছে!" 'বিশ্বনাথ এমন ভাবে কথাটি বলে যেন এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। চাপরাশীর কথা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

চাপরাশী মিহি গলায় বলে, "বাবু আমার আজ বাড়ীতে একটু কাজ আছে।"

"বেশতো বাড়ীতে কাজ থাকলে যাও না।"

"রাত্রের দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে যাচ্ছি," কথাটি বলে চাপরাশী চলে যায়।

রাত দশটা নাগাদ বিশ্বনাথ বাড়ী ফেরে। ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু পার্বতী দোরগোড়ায় তার প্রতীক্ষায় বসে ঘুমে ঢুলছে। সামান্য কিছু আওয়াজ হলেই চোখ বড় বড় করে দেখে নিচ্ছে পথের দিকে, তার স্বামী এসেছে কিনা।

বিশ্বনাথ আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। "তুমি এসেছ!" পার্বতীর দরদ-ভরা আওয়াজ বিশ্বনাথের কাছে অসহ্য লাগল। শুনতে পারলনা। ছুটে নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরের দিন সকাল।

পার্বতী নিজের বড় ছেলে প্রসাদকে বলে, 'খোকা তোর বাবাকে ডেকে দেত। বেলা অনেক বেড়ে গেছে। এখনও ঘুম থেকে উঠছে না কেন বুঝতে পারছিনা।"

"বাবা বাবা" বলে ডাকতে ডাকতে প্রসাদ বাবার ঘরে ঢোকে। দরজাটা খোলা। ভিতরে তার বাবা নেই। নিরাশ হয়ে ফিরে এসে কান্না কান্না ভাব নিয়ে মাকে বলে "মা, মা, বাবা ঘরে নেই!"

সন্ধ্যা হতে না হতেই পুলিশের লোক এসে বিশ্বনাথের বাড়ী ঘিরে ফেলে।

ঘরে তল্লাসী হয়। তারপর পার্বতীর সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করে কি সব লিখে নিয়ে পুলিশ চলে যায়। এলাকার সব লোক ঐখানে জমা হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ঐ বাড়ীটা যেন সকলের কাছে একটা কৌতুহলের বস্তু হয়ে যায়। লোকে বলাবলি করে, "লোকটাকে এমনি দেখলে মনে হত গোবেচারা, সাদাসিধে মাটির মানুষ। এক নয়, দুই নয়—দশ, দশ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে!"

পার্বতী কাচ্চাবাচ্চাদের কোলে বসিয়ে সারারাত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। মনে মনে বলে, আমাদের এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে সে চলে গেল। হে ভগবান, কি ভাবে জীবন কাটবে! নদীর মাঝ পথে সে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, এই বাচ্চা ছেলেপুলেদের আমি বড় করব কি করে। এরা মানুষ হবে কি করে?

বিশ্বনাথের ঘর আত্মীয়স্বজন আর দরদী-অদরদীদের সমাবেশে ভরে গেল। কয়েকজন পার্বতীকে দু'একটা সান্ত্বনার বুলি শুনিয়ে বিদায় নিল। পথ চলতি লোক একঝলক ঐ ঘরের দিকে তাকিয়ে যেতে লাগল। ওটা যেন ডাকাতের আস্তানা।

তিন দিন হয়ে গেল। সে বাড়ীতে লোকের আনাগোনা কমে গেল। ঠিক তৃতীয় দিনের রাত্রে পার্বতীর ভাই নিজের বোনকে সান্ত্বনা দিতে মাদ্রাজ থেকে এল।

ভাইকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে। অসহায় অবস্থার কান্না—সব হারানোর কান্না।

পার্বতীর ভাই বলে, "কেঁদ না বোন! কেঁদ না! সবই ভাগ্য। কাল

ভোরের ট্রেনে মাদ্রাজে চল। সেখানে আমার বাড়ীতে থাকবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।"

পার্বতীর আশ্চর্য লাগল। সে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এ সব কি বলছ, আমিত জানি তুমি কত মাইনে পাও। নিজের সংসার তুমি নিজেই সামলাতে পারছ না। আবার বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আমাদের নিয়ে গিয়ে চালাবে কি করে?"

বোনের কানে কানে বলে, "যার যেখানে যাওয়ার ছিল, সে সেখানে চলে গেছে। তবে কথা হচ্ছে—যে গেছে সে সব ব্যবস্থা করেই গেছে। মা-ছেলে আর তোমার জন্যে অগাধ টাকা আমার কাছে রেখে গেছে। তোমরা বছর কয়েক নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। প্রথম ট্রেনটি ভোর চারটের সময় ছাড়ে। আমরা ঐ ট্রেনেই চলে যাবো! বুড়িকেও দেখছি কোণে পাথরের মত বসে আছে। ওকে এখন থেকে জানিয়ে কাজ নেই। ঠিক সময়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। নাও তাড়াতাড়ি—কি হলো! ও ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ কেন কি ভাবছ?"

●

কুঁড়ি

গুড়ুপাতি ভেঙ্কট চলম্

কাজলকালো রাতে একটি কুঁড়ি ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে "মা" বলে চীৎকার করে ওঠে। পাতা আর ডালগুলো ঐ শ্বেতশুভ্র ছোট্ট কুঁড়িটিকে নিজেদের কোলে টেনে নেয়। ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিয়ে তাকে অভয় দেয়।

"কোথায় সে ?" কুঁড়ি বলে ওঠে।

"কে ?" ওর মা লতা অন্ধকারে জিজ্ঞেস করে।

"যে আমাকে তোমার কাছে এনেছে।"

"কে আর তোকে আনবে। আমি নিজে তোকে এই পৃথিবীতে এনেছি, মা।"

"ও তাহলে তুমিই এনেছ ? আমি ভাবলাম অন্য কেউ বুঝি। তাহলে তুমিই আমাকে ঐ তারাগুলোর মাঝ থেকে হাত ধরে খেলাতে খেলাতে হাসাতে হাসাতে এখানে এনেছ। একবার তোমার মুখটা আমাকে দেখাও না, মা।"

"সকাল হলে আমাকে দেখে নিও। এখন ঘুমিয়ে পড়, লক্ষীটি।"

"আমার খুব ভয় করছে। হয়ত আমি এখান থেকে নীচে পড়ে যাবো।"

"তুইতো আমার কোলেই আছিস, মা। তোর আবার ভয় কিসের।"

"মা আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।"

কুঁড়ি খেতে চাওয়ার পর তার মুখে গরম আর মিষ্টি এমন কিছু ভরে গেল যার ফলে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আনন্দ-বিভূতিতে ভরে যায়।

"ও ! এসে গেছে মা।" বলতে না বলতে হাওয়া এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে দোলাতে থাকে।

"মা, আমার পেছনে ওটা কি বলত আনাগোনা করছে।"

"ও এমন কিছু নয় মা, সাপ খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"আমাকে খেয়ে ফেলবে নাতো ?"

"তোকে খাবে কেন। ও খুব ভাল। ও শুধু পাখীর বাচ্চাদেরই খায়। ও আমাদের কোন ক্ষতি করবে না মা।"

বিরাট বিরাট গাছের আড়াল দিয়ে চাঁদ উদিত হচ্ছে। কুঁড়ি চোখ ড্যাব ড্যাব করে দেখে। গাছের ডালগুলো দুলতে থাকে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে মাটিতে আছড়ে পড়ছিল। আর তারই সমান্তরালে দীর্ঘ রেখাঙ্কিত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ঠায় বসেছিল। চারিদিকের আরণ্যসুষমায় মুগ্ধ হয়ে সে বলে ওঠে "দেখ মা, দেখ!" তারপর উচ্ছ্বসিত আনন্দে জোরে হাততালি বাজাতে শুরু করে।

ঘুমের চোখে তার মা গান গায়। কুঁড়িটি মুখ তুলে তার মার দিকে তাকিয়ে বলে, "মা, তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে!"

তার মা লতাকে অন্ধকারে কে যেন আটকে রেখেছে। সেখান থেকে তাকে প্রায় অদৃশ্য হতে হবে। মাদকতাপূর্ণ এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়ে পাতাগুলো যেন কালো ছায়ার মত দুলছে।

"মা তুমি কাকে অমন ভাবে ধরে রেখেছ? কে সে, তোমার এ বন্ধন সহ্য করেও গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে?"

"এ তোমার বাবা।"

"মা-মা-মা-! কে সে। কি বিশ্রী আওয়াজ করছে। আমাকে ধর মা।"

"ও বাঁদর। তোর বাবার জন্যে আসছে। তোকে কিছু করবে না।"

"তাহলে বাবা তাকে..."

ফুল-কিন্নরগুলো তার নাম নিয়ে, গান গেয়ে চাঁদের আলোতে দুলতে দুলতে তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কুঁড়ি তাদের ভাল ভাবেই চেনে।

"তুই জন্মেছিস, তুই এখানে জন্মেছিস।"

চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে তারা তাকে স্নান করালো। তার সুকোমল পাপড়িগুলোতে সুন্দর রঙের পোঁচ দিয়ে তার গলায় রঙীন মালা পরিয়ে দিলো। তার পেছনে অদৃশ্য ভাবে ওখানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে ওকে। কে জানে কবে থেকে কোন অনন্তকাল থেকে, কতরূপে, কত আনন্দমুখর মুহূর্তে তার হাতে হাত রেখে একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ছায়ারূপ।

তার মাথার উপরের অন্ধকার থেকে একটা মিষ্টি ডাক এলো দূরান্ত থেকে আসা সঙ্গীত ধ্বনির মত। এই ডাক কিসের জন্যে। পাতাগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে। মৃদু মৃদু পুলকিত হাওয়া বইছে।

"কে ? কে সে, খুঁজছি তবু তার দেখা পাচ্ছি না।"

"মা-মা কে সে !"

"কোকিল !"

"কাকে ডাকছে মা ?"

"নিজের প্রেমিকাকে।"

"সে আসছে না কেন ? কে সে ?"

"অন্ধকার যে !"

"মা, সে যে চুপ করে গেছে। তাকে আবার ডাকতে বল না মা।"

"সে নিজেই ডাক দেবে।"

"কত সুন্দর এই পৃথিবী, এখানে না এসে আজ পর্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম মা।"

কুঁড়ির সামনে থাকা আগুনের ফুলকির মত লাল এক ফুল আঁধার ঢাকা পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিকশিত হয়। হাল্কা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো মেঘের আড়াল দিয়ে সে নিজের হাত কুঁড়ির দিকে এগিয়ে দেয়।

যেদিকে তাকাই উৎসব মুখরিত পৃথিবী। বিভিন্ন ধরনের বাজনা আর হাসিখুশির উচ্ছলতা। প্রত্যেকটি জায়গায় যেন পাতার তোরণ বাঁধা হচ্ছে। সিংহ জয় ঘোষণা করছে। মেঘ প্রত্যেকটি দিককে রঙ-বেরঙে সাজাচ্ছে। আনন্দের আতিশয্যে পবনদেব খুব ছুটোছুটি করছে। ধূলোমাটি ঝেড়ে সকলের ঘুম পাড়িয়ে শুকনো পাতাগুলোকে তুলে ছুড়ে ফেলছে। গাছ হাওয়ার মুখ খুলে প্রাতঃকালীন জলপান করতে ব্যস্ত।

প্রকাশ ! প্রকাশ ! সারা বিশ্বে প্রকাশের মুখরিত আনন্দ। নদীর ধারায় মতই আকাশে-বাতাসে আনন্দমুখর দৃশ্যাবলীর ইন্দ্রজাল।

সংসারের রংরূপ বদলে গেল। অর্ধেক চাঁদ হাসতে হাসতে সেলাম করতে করতে আকাশে বিলীন হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে শুকতারা আকাশের কোন এক কোণে লুকিয়ে যায়। মেঘ যেন লজ্জা পেয়ে নিজের শরীরটাকে ধুয়ে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।

দীপ্যমান প্রকাশে লাল হয়ে অন্ধকারের ক্ষুদ্রতাকে দিব্য তেজের কিরণচ্ছটা দিয়ে সরিয়ে সূর্যদেব পথ চলা শুরু করেন। পাখীরা পাখা মেলে উড়তে

শুরু করে। জীবজগৎ আলস্য ত্যাগ করে সারাদিনের পথ চলার জন্যে কোমর বাঁধে। পবনকুমার যেন গাছের চূড়ায় চূড়ায় বসে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

সদ্যজাত কুঁড়িটি চোখ মিট মিট করে তাকায়। দৃষ্টি একটু বিস্ফারিত করতেই সূর্য তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। "মাগো আমি যে মরে যাব!" বলেই কুঁড়িটি চোখ বন্ধ করে। শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। শরাহত পাখীর মত সে ছটফট করতে থাকে। পরক্ষণেই তার মনে হল তার যেন রূপান্তর ঘটেছে। মাটির বুক থেকে মূলের সাহায্যে পাওয়া অমৃত সুধা পান করে যেন সে হঠাৎ তেজ পায়। "মা!" বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঐ ডাকে ভয়, আনন্দ, মৃত্যু, জন্ম কোন কিছুরই বেদনার আভাস ছিল না। সে ডাকে ছিল যৌবনাগমনের আনন্দানুভূতির আভাস। কুঁড়ির হঠাৎ একি হতে চলেছে!

সেই মধুর চাঁদের আলো, সেই হাল্কা রোদ, নীচের ঘাসের সেই মনোরম দৃশ্য, আকাশের সুনীল রঙ, পিতার শক্তি, কোকিল কণ্ঠের প্রতি করুণা, হাওয়ায় অর্থহীন কোলাহল আর মায়ের দেওয়া ধরিত্রীর বুক থেকে আনা সেই সুধা... সবকিছু মিলিয়ে কুঁড়ির জীবনে আসে নতুন ছন্দ, নতুন রূপ, নতুন আনন্দ।

তার পাপড়িগুলোতে যেন হাসি দোল খাচ্ছে। রঙের অপরূপ ছন্দ, আর শরীরে আছে স্নিগ্ধতায় ভরা সুমধুর সুবাস। তার বুক থেকে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মাদকতায় ভরা সুবাস। সৌন্দর্য-সুষমা হয়ে উঠেছে অনুপম।

সুমধুর সুবাস যেন তার সারা শরীরে এনেছে জোয়ার। সেই মনোরম গন্ধে যেন নিজেকে, নিজের মাকে, হাওয়াকে, আকাশকে পরিপূর্ণ করেও বাকিটা চুঁইয়ে, চুঁইয়ে ঝরিয়ে দিয়ে সিক্ত-সুভাষিত করে দিচ্ছে কোমল মাটিকে।

কুঁড়ি নিজের আনন্দ আর চেপে রাখতে না পেরে প্রাণ খুলে খিল খিলিয়ে হাসে। ঐ হাসির চপলতায় সূর্যদেবের ক্রোধ যেন বেড়ে যায়। আর তাই দেখে ও আরও বেশী করে হাসতে থাকে।

হাসি আনন্দের ঐ মধুরতায় আকাশ মাটির বুকে নেমে আসবে নাই বা কেন। পবনদূত কি আর এই সুখবর ত্রিভুবনে ছড়িয়ে না দিয়ে বসে আছে।...এই গাছ, এই পাখী, এই পশু...এই অনন্ত আকাশ, এই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর সব কিছুই যেন তার সুগন্ধ সৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

এখন আর তার মোকাবিলা কে করতে পারে। ফুল (এখন আর কুঁড়ি অবস্থায় নেই) সোরগোল করে নাচতে, হাততালি বাজাতে সুরু করে। তার চোখ দিয়ে যেন এক উজ্জ্বল আলো ছিট্‌কে পড়ছে, উপচে পড়ছে। 'যে কেউ তার সামনে দিয়ে যাক না কেন, পাতার আড়াল থেকে তার দিকে একবার উঁকি মেরে মুচকি হাসি না হাসলে যেন থাকতে পারে না সে। সারা পৃথিবীতে যেন সে তার সৌরভের জল ছড়িয়ে বসে আছে।

এক মৌমাছি সখীদের সঙ্গে, সঙ্গীত নৃত্যের মুগ্ধ-মাদকতায় টলতে টলতে যৌবন রসে স্নান করে হলদে রঙের পরাগ সজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল।

রোদে চমকাতে থাকা তার ঐ পীত পরাগময় কালো শরীর, তার ঐ লম্বা লম্বা শুড়, রক্তাভ চোখ, আর হাওয়ায় ঝাপটায় দুলতে দুলতে থাকা তার ঐ বড় বড় গোঁফ দেখে ফুল কেঁপে ওঠে।

"মা, কে সে ?" বলতে বলতে সে তার মায়ের সবুজ আঁচলে মুখ লুকিয়ে নেয়।

মা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

"সে তোকে ছাড়বে না, মা।" মার চোখে মুখে কি এক হাসির ছদ্মবেশ। "ছাড়বে না, এত অহঙ্কারী ?" বলতে বলতে পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারে যৌবনবতী। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। সুগন্ধ যতই চেপে রাখে ততই যেন সে নিজেকে দুর্বল বোধ করে। দম যেন তার আট্‌কে আসে। আর সেই সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে, বিভোর হয়ে যায় ঐ মক্ষিরাজ।

"মা দেখ, ও এখানে কি রকম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সরার নামটি করছে না।" কিছুটা ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে ফুল বলে।

কিন্তু নিজেকে আটকে রাখতে না পারা, সামলাতে না পারার একি ধরনের বেদনা। ভীত করে দেওয়া, ব্যথাতুর করে তোলা, এ কি ধরনের আকাঙ্ক্ষা যা তার অজান্তেই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

তারদিকে ফিরলো ঐ মধুমক্ষিকা। সে তার সঙ্গীদের চলে যেতে বলে। তারা আবার তার গায়ে তাজা ফুলের পরাগ ছড়িয়ে তাকে সাজিয়ে দিয়ে আশ-পাশের পাতার উপর বসে খিল খিল করে হাসতে থাকে।

মধুমক্ষিকা এমন সাহসিকতার সঙ্গে ফুলের দিকে উড়ল যেন তার পথ রুদ্ধ

করার কেউ নেই। রোদে চমকাতে চমকাতে, উড়তে উড়তে সে অনির্বচনীয় ছন্দে অগ্রসর হচ্ছে।

লজ্জা .... লজ্জা ....লজ্জা··· !

লজ্জায় লাল হয়ে ফুল নিজের মুখ লুকোয়, ভয়ে আর আনন্দে সে কাঁপতে থাকে। তার মনে হয় সে যদি না আসে। তখন ! কিন্তু সে আসছে, ক্রমশঃ তার দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে।

সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলে।... সে আসছে !

ইস্, কত দেরী করছে এইটুকু পথ আসতে। যাক্···আসুক না, দেখাচ্ছি মজা······তার সঙ্গে কথাই বলবো না। আমাকে রাজি-খুশি করাতে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার কাছে কিছুতেই ধরা পড়বো না। পাতার আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। হন্যে হয়ে খুঁজতে হবে তাকে।

কিন্তু মধুমক্ষিকা খুব সহজ ভাবে পাতাগুলো সরিয়ে ফুলটিকে সকলের সামনে একেবারে বাইরে তুলে ধরে। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে অনুরাগ ভরা স্বরে ফুল তাকে বলে, "যাঃ অসভ্য" কিন্তু এ কণ্ঠস্বরটা কার, আমার নয়ত ?

কত মাধুর্য আছে এই কথায়। এই ভাবের আহ্বান কিসের জন্যে। কতো না গভীর মনের সেই আকুলতা—যা শত চেষ্টা করলেও আয়ত্তের বাইরে ছুটে যায়।

গুন্‌গুনিয়ে এক ঝঙ্কারময় প্রেমসঙ্গীত গাইতে গাইতে মধুমক্ষিকা ফুলের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। তারপর নিজের সামনের পাগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার পাখায় পড়তে থাকা রোদ যেন আলোক রঙে জ্বল জ্বল করছে। তার গা থেকে আসা মাদকতায় ভরা সুগন্ধে ফুলের মন মাতোয়ারা হয়ে যায়।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মধুমক্ষিকার প্রেমসঙ্গীতে ফুল ভাবে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। একি সঙ্গীত, না সমুদ্রের ডাক অথবা রক্তের নতুন স্পন্দন।

মধুমক্ষিকা খেলা করছে। হাসছে আর মাথা নুইয়ে সামনের দিকের পাগুলোকে জোড় করে যেন বলছে, হাজার বছর ধরে আমি তোমাকেই খুঁজছি, আমার সব কিছু তোমার জন্যে। নিজের সব কিছু তোমার আলিঙ্গনে উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার জন্য আমি আগ্রহী। একবার, শুধু একবার মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখ !

সে মিথ্যা কথা বলছে। আমাকে বুঝ দিচ্ছে। তবুও এই মিথ্যা কথাই কত সুন্দর লাগছে। কত মিষ্টি, কত মধুর।

ফুল নিজের শ্বেতশুভ্র পাপড়িগুলোকে মেলে ধরে মৃদু হাসির রেখা টানে। তারপর আবার পাতার আড়ালে লুকোয়। কি রকম এক দুর্বলতা যেন শরীর-মন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সে তার কাছে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না কেন? কোথাও চলে যাবে নাত?...না, সেত পাখা নাড়তে নাড়তে গুন্‌গুন্ করে গুঞ্জন করতে করতে আমার সামনে মাথা নত করে আমাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করছে।

"যাও, যাও।" ফুল আবার বলে ওঠে ভয়ে ভয়ে। যদিও তার মন বলছিল প্রেমিক বন্ধু আমায় ছেড়ে যেয়োনাক তুমি।

মনের কথাটি ও যেন শুনে ফেলেছে, তাই সাথে সাথে ফুলের পাপড়ির কি অবস্থা হবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঝাঁপিয়ে বসে পড়ে তার গায়ে নির্দয়ভাবে। যেন সে ফুল একমাত্র তারই। তার উপর তার যেন পূর্ণ অধিকার রয়েছে ঐ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

"মা"! ফুল জোরে চীৎকার করে ওঠে। সেই চীৎকারের মধ্যে যেন আছে মৃত্যুর আর্তদান।

ওর মা শুনেও না শোনার ভান করে থাকে।

মা কেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।...সবাই কি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে? এই কি তার পরিণাম।...তার জীবন যেন এখন শেষ হতে যাচ্ছে।

নির্মম মধুমক্ষিকা ফুলের সেই কোমলতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ক্রূরতার সঙ্গে তার অন্তরকে নখের খোঁচায় চিরে তাতে বুবুক্ষের মত নিঃশেষে পান করতে থাকে তার হৃদয়ের সঞ্চিত রস—মধু। সে মধু সম্পর্কে ফুল নিজেই জানত না কিছু।

ফুলের শরীর যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবশ হয়ে যাচ্ছে। তার রক্তই যেন পান করে নিচ্ছে মধুমক্ষিকা। নিজের পেছনের পা দুটি দিয়ে তাকে চেপে ধরে তার বুক চিরে নিচ্ছে। কি হবে পরে...কি করে নিজের মুখ দেখাবে সকলের সামনে।

তারপর একি হল!...ফুলের পাপড়িগুলো হঠাৎ এগিয়ে এগিয়ে মধুমক্ষিকাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে নেয়। তাদের হাত দিয়ে তারা জোর করে তার কোমর আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে ধরে নিকটতম সম্পর্ক আনে। তারপর ফুল তার নিজের

পরাগ মাখিয়ে দেয় মধুমক্ষিকার সারা শরীরে। ফুল নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে বিসর্জন দেয় তার কাছে। যা কিছু সবই দেয়, কিছুই রাখে না।

তারপর বলে, "এখন আমার সব কিছু তোমার। আমার কাছে আর কিছু নেই। তুমি আমার সর্বস্ব। আর...আর...আর আমার জীবনকে, আমার আত্মাকে তুমি আকণ্ঠ পান করে নাও।" কি এক অদ্ভুত রহস্যময় স্বরে সব হারানো ফুল বলতে থাকে।

তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে ফুল। যে সূর্যকে এর আগে দেখেছে, সেই সূর্য তার চোখের সামনে এসে চিক্‌চিক্ করছে। যে নক্ষত্ররাজিকে এর আগেও দেখেছে দূরে, তারা সব এগিয়ে এসে যেন তার কাছে নাবছে। সমুদ্রে উঠেছে ঢেউ গর্জন। সে কি করে সহ্য করবে এ পরম আনন্দকে। এই মধুমক্ষিকার দেওয়া ব্যথা যে তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিবিষ্ট হয়ে আছে আনন্দের অনুভূতি হয়ে।

তার শরীর কেটেখুটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না কেন! তার শিরা-উপশিরাগুলো ছিড়ে যাচ্ছেনা কেন এখনও। তার পাপড়িগুলো কেন এখনও লুটিয়ে পড়ছে না মাটিতে।

রসিক মধুমক্ষিকা তাকে ছেড়ে দেয়। তার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাকে ছেড়ে তার চোখে চোখ রেখে মুচ্‌কি হাসির রেখা টানে সে।

সে হাসির জবাবে ফুল এখন আর কি বা দিতে পারে। মধুমক্ষিকা পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসতে হাসতে বিদায় নিচ্ছে।

ফুল কিভাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ফুল বিনম্রভাবে তাকে প্রণাম করে।

মধুমক্ষিকা ফুলের উপর নিজের পাদুটি রাখে তারপর আয়াসের সঙ্গে হাওয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলোছায়ার চমকে ওঠা পাখা-দুখানি মেলে দুলতে থাকে বাতাসে। রং-বেরঙএর দৃশ্যরাজির মধ্য দিয়ে সে উড়ে যাচ্ছে। ফুল যতদূর দৃষ্টি যায় ঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পাতার অন্তরালে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকা ফুল চিন্তা করে, সমস্ত লজ্জাকে দূরে সরিয়ে পৃথিবীর সামনে কিভাবেই বা উপস্থিত হবে সে।

তারও পাখা থাকলে কত সুন্দর হত। নিজের মা, বাবা, সাথী সব কিছু ছেড়ে ভুলে গিয়ে ঐ মধুমক্ষিকার জীবনসঙ্গিনী হয়ে তারি সঙ্গে থাকতে পারত সে আজীবন।

তার চারিদিকে ঘুরে ফিরে বনকন্যারা যেন মাঙ্গলিক গান গাইছে। আশীর্বাদ বর্ষণ করছে তার উপর। সে নিজের শরীরের উপর একটি গর্বিত দৃষ্টি ফেলে। কে জানে কত তপস্যার পরে সে তার এই পরিপূর্ণতা পেয়েছে। নিজের শরীর কিছুটা ভারি হয়ে গেছে বুঝে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেন নাচতে শুরু করে ঐ ফুল।

সূর্য যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছে। তার এই গমনপথে পড়া পাতাগুলো যেন ঝলসে যাচ্ছে।

তোতাপাখীগুলো একদল সব উড়ে পালাচ্ছে। মধুমক্ষিকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে একসঙ্গে পাখনা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের মেঘের কোলে চিল অনেকক্ষণ ধরে যেন একই জায়গায় পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে আসতে থাকা ছায়াকে আলস্যভরা দৃষ্টি ফেলে দেখে শান্তভাবে বসে নিজের জঠরের অঙ্কুরকে বলিষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস পায় সে। তার সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় যাক। তার সমস্ত সুগন্ধ লুপ্ত যদি হয়ে যায়, ক্ষতি নেই। মধুমক্ষিকা লোলুপদৃষ্টি মেলে যদি তার দিকে না তাকায়, না তাকাক। এখন তার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। জীবন সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা এখন ভিন্ন রূপ। এখন সে অনুভব করছে নিজের অন্য এক জীবনের স্পন্দন। নিজের থাকার জায়গা সে করে নিচ্ছে। ফুলের জঠরের পেশীগুলোয় দিচ্ছে টান। মধুমক্ষিকাকে যে পাপড়িগুলো জোর করে আটকে রাখতে পেরেছিল, পরাগ মাখাতে পেরেছিল, তারা এখন কি রকম যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা সব সৃষ্টিলীলার আনন্দে প্রখর রৌদ্রতাপ যে যার খুশিমত বিচ্ছিন্ন তালে, লয়ে, সুরে নাচছে, গাইছে। হাওয়ার ঢেউএ রোদ তাদের উপর হেলে-দুলে নাচছে।

মা-হতে যাওয়া ফুল উঁচু আকাশে প্রখর তেজীয়ান সূর্যের বিষ নজরে পড়ে। অগ্নিবর্ষী চোখে তাকাতে তাকাতে যমরাজ যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। পরাগহীন, মধুহীন, সৌন্দর্যহীন...পাপড়িগুলো ঝরে গিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে, তার সুকোমল চুল যেন মাটিতে ঝরে ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু ফুলের দৃষ্টি পড়ে আছে নিজের জঠরের দিকে। সে নিজেকে, নিজের সৌন্দর্যকে বিশ্বের সব কিছুকেই এই সময় ভুলে গেছে। সে ভাবছে, তার জঠরের উদীয়মান জীবনের চেয়ে অধিক সার্থক জিনিস পৃথিবীতে আর কি আছে!

প্রতীক্ষা

সুরবরম প্রতাপ রেড্ডি

"আচ্ছা শঙ্কর প্রত্যেকদিন সূর্যদেব পূবদিক দিয়ে ওঠেন আর পশ্চিম দিক দিয়ে অস্ত যান। সারারাত কোথায় থাকেন বলত? আর প্রত্যেকদিন পূবদিকেই বা আসেন কোত্থেকে?"

"এতো চিরকালের নিয়ম। সূর্য উঠবে—অস্ত যাবে। এতো হতেই হবে। আমাদের এই গাঁয়ে পূব-পশ্চিম দুদিকেই সাগরের সীমানা। তাই মনে হয় যেন সূর্য পূবদিকে উঠে পশ্চিম সমুদ্রে বিদায় নেয়।"

"তা হলে অন্য দেশে কি হয়?"

"আমাদের এখনাকার মত সব দেশতো আর সমুদ্রেঘেরা সুন্দর নয়। উত্তরের দেশে গেলে দেখবে সূর্য যেন পূবদিকের গাছপালার মধ্য থেকে উদয় হয় আর পশ্চিম দিকের দূরের গাছপালার মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে অস্ত যায়।"

"ঐ দেখছ! ঢেউ, কেমন সুন্দর একের পর এক এসে হুমড়ী খেয়ে পড়ছে। ঠিক যেন আমরা বালি-খাড়ির উৎরাই এ খেলা করতে গিয়ে একের উপর অন্য গড়িয়ে পড়ি! ওরা এক মুহূর্তও বিশ্রাম করে না।"

"প্রত্যেক ঢেউয়ের মধ্যে ভারি ভালবাসা। একটা ঢেউএর উপর আর একটা এসে কেমন ঢলে পড়ছে, দেখছ! ...যাক ওসব কথা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুববে। এস প্রত্যেক দিনের মত এখান থেকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আমরা একবার গড়াগড়ি যাই।"

"প্রত্যেকদিন আমি প্রথমে গড়াই, এটা ঠিক নয়। দেখ, কত উঁচু! কুড়ি পঁচিশ হাত হবে"

"তোমাকেই শুরু করতে হবে।"

"না, আগে তোমার পালা?"

"আচ্ছা, এসো।"

শঙ্কর প্রথমে ঐ টিপি থেকে শুয়ে পড়ে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত গড়ায়। কুমারীও তাকে অনুসরণ করে। শেষে কুমারীর কিশোর কালো দেহ শঙ্করের উপর এসে পড়ে। দুজনেই খিল খিল করে হাসে। সারা শরীরে বালি লেগে যায়। ওসব ঝেড়ে ফেলে আবার সেই টিপির উপর ওঠে। আবার গড়ায়। আবার ওঠে। আবার গড়ায়। গোধূলি বেলা পর্যন্ত এরই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন ডানা মেলে নামে পৃথিবীর বুকে। সন্ধ্যার ধূসরতা থেকে রাত্রির কাজল কালো রংএর হয় আবির্ভাব। সেই আঁধার ঘন রাতে তারা বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

শঙ্করের মা-বাবা শৈশবেই মারা যান। শঙ্করকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন তার মামা। এখন তার বয়েস পনের। কৈশোর আর যৌবন যেন তার দেহে ক্রীড়ারত। সাধারণত ত্রিবাঙ্কুরের ছেলেরা কালো হয়। কিন্তু শঙ্করের গায়ের রং বাদামী। প্রত্যেক দিন তার মামার সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে সে মাছ ধরত। কুমারী মা-বাবার এক মেয়ে, খুব আদুরে। বয়স কম হলে কি হবে মাছ, কলা আর কাঁঠাল দিয়ে তরকারী আর সোম্বার (তরকারী এবং তেঁতুল মিশ্রিত ডাল) রান্নার ব্যাপারে তার হাত ছিল খুব পাকা। গায়ের রং কালো হলেও রক্তের আরক্তিমতা কালো দেহের বন্ধনকে অস্বীকার করত অনন্য এক উজ্জ্বল্যে। প্রতিটি অঙ্গে তার সুশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের ছাপ। চুল খুব দীর্ঘ আর ঘন। কালো রেশমের মত। শঙ্কর কৈশোরের শেষ সীমায়—যৌবনের দ্বার প্রান্তে আর কুমারী তন্বঙ্গী কিশোরী। কুমারীর মুখের একটি হাসির রেখা যেন শঙ্করের শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তার স্বর যেন একতারার তান তোলে শঙ্করের হৃদয়ে। তার কথা শঙ্কর মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার মত কান পেতে শুনত। যেখানে খুশি যেত আদরের দুলালী কুমারী কেউ বিশেষ বাধা দিত না।

শঙ্করের মামারই মেয়ে সে। কাজেই লোকের একটা স্বাভাবিক ধারণা হয়ে ছিল যে, শঙ্করের সঙ্গে কুমারীর বিয়ে হবে। (দাক্ষিণ ভারতে পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে মেয়েদের পক্ষে সৌভাগ্যসূচক বিবেচিত হত) অতশত ভাববার বয়স তখনও তাদের হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্মুখীন ভালবাসা আরও দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। পরস্পরের প্রতি একাত্মবোধ জাগ্রত হয়। একে

অন্যের সঙ্গ কামনা করে। প্রত্যেকদিন সমুদ্রতীরে যাওয়া তাদের ঐকান্তিক সঙ্গ কামনাকে পূর্ণ করত।

এমনিভাবে কয়েক বছর কেটে যায়, শঙ্করের বয়স হয় কুড়ি আর কুমারী ষোলোর কোঠায় পা দেয়। কুমারীর প্রতি অঙ্গে নামে যৌবন-জোয়ারের ঢল। রক্ত গোলাপের পাপড়ি প্রতীম তার ঠোঁট, আর চোখে তার রৌদ্র ছায়ার স্বপ্ন মায়া। শাশ্বতপ্রেমের স্পর্শমদির তার মুখের হাসি, অকপট তার ভাষণ, সহজ-সরল অথচ গাম্ভীর্যে ভরা মৌন-মুগ্ধ রূপময় তার দেহলাবণ্য শঙ্করকে বিস্ময়ে আনন্দে রোমাঞ্চিত করে তুলল। তখনকার দিনে কেরালার মহিলাদের পোষাক ছিল মাত্র ছোট একটা লুঙ্গি, যাকে বলা হত "মণ্ডু"। নারিকেল কুঞ্জঘেরা সমুদ্রতরঙ্গায়িত সেই সৌন্দর্যের উপবনে কুমারীর সৌন্দর্য পোষাকের সামান্যতায় আরও অসামান্য হয়ে আকর্ষণ করত শঙ্করকে। এখন তারা বড় হয়েছে, তবুও তাদের সেই বালি-খাড়ির উৎরাইয়ে নিজেদের দেহকে এলিয়ে দিয়ে, গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস আজও তাদের আছে। বয়সোচিত লজ্জাও তাদের আছে বৈকি! তবে শঙ্করের কাছে কুমারীর আর কুমারীর কাছে শঙ্করের লজ্জার কি থাকতে পারে। বালি খাড়ির ধারে নির্জন প্রকৃতি তাদের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের লীলাময়তার দর্শক। আজও সেই বালির ঢিপি থেকে গড়াতে গড়াতে কুমারী যখন এসে শঙ্করের বুকে পড়ে, তখন শঙ্কর যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে; ভুলে থাকে এই পৃথিবীকে। সেই নব যুবতীর হাত ধরে স্নিগ্ধ হাওয়ার তরঙ্গ বেয়ে রাত্রে যখন সে বাড়ীর দিকে ফেরে তখন তার শরীর-মন যেন কোন এক অনন্য আবেগে আবিষ্ট হয়ে থাকতো। কুমারী যখন জোৎস্নাদীপ্ত রাতে শঙ্করের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো তখন নীরব প্রকৃতির অশ্রুত নৃত্য নুপুরের ধ্বনি বেজে উঠত হৃৎস্পন্দনের মধ্যে। শঙ্করের চুম্বন যখন কুমারীর কপোলকান্তিকে আরক্তিমতায় উজ্জ্বল করে তুলত তখন অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকত সেই অব্যক্ত সৌন্দর্যের প্রতিমার দিকে। পাড়াপড়শীরা তাদের দেখে বলত, "অপূর্ব-জুটি—এ যেন একজোড়া শান্ত পারাবত।"

সেদিন শঙ্কর এবং কুমারী সমুদ্রতীর থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছিল। শঙ্কর বলল—"কুমারী! জান সামনের রবিবারেই আমার বিয়ে। সারা বাড়ী-ঘর গোছান হচ্ছে।"

"হ্যাঁ জানি।"

"কুমারী ! আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী হব, খুব আনন্দ হবে না ?"

"আনন্দ হবে ? এখন কি আমরা আনন্দে নেই। আমারতো বেশ সব সময়ই আনন্দ লাগে। বিয়ের পরও আমরা রোজ খেলতে যাবো কিন্তু, মনে থাকে যেন।"

"বারে, বিয়ের পরে আমরা খেলার সময় পাবো কোথায়। ঘর-সংসার দেখতে হবে না। কত কাজের ভার এসে পড়বে। আমায় রোজ মাছ ধরতে যেতে হবে আর তুমি ঘর-দোর দেখবে, মা-বাবার সেবা করবে আর আমি…"।

"তাহলে তুমি আমাকে ভালো বাসবে কখন ? আমার সঙ্গে বেড়াবে কখন ?"

"সে ঠিক দুজনে সময় করে নেবো, আমার মনোমন্দিরে তুমি হবে দেবী ? ফুল দিয়ে আমি তোমায় পূজো করব। সবাই করবে।"

কুমারী মৌন মুগ্ধ হয়ে এই সব কথা শোনে।

"আমি প্রত্যেক দিন মাছ ধরতে সমুদ্রে যাবো, তুমি সন্ধ্যের দিকে ভাত-সোম্বার নিয়ে আসবে সমুদ্রতীরে, কি ? আসবে তো ?"

"তুমি ফেরার বহু আগেই, আমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।"

"আমি বাইরে বেরুলে তুমি ঘরের কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ে আমাকে হয়ত ভুলে যাবে।"

"না না তাকি হয় ? আমি তোমাকে ভুলব না, ভুলতে পারি না। তোমাকে ভুলতে গেলে মনটা আমার খালি হয়ে যাবে, আমি পাগল হয়ে যাবো।"

রবিবার শঙ্কর আর কুমারীর বিয়ে।

শঙ্কর শনিবার দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের তীরে পৌঁছল। কুমারীকে আনন্দের আবেগে কাছে টেনে নিয়ে শঙ্কর তাকে বল্ল, "কুমারী আমাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে বিয়ের জন্য কমপক্ষে সাতটি মাছ আমাকে ধরে আনতে হবে। আমি এখন যাব আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব। শরীরটা যেখানেই থাক, মনটা তোমার কাছেই পড়ে থাকবে। কালকেই আমাদের বিয়ে, আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে কুমারী।"

"খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে তো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"মাছ ধরতে গিয়ে সুন্দরী সমুদ্র কন্যাকে ভালবেসে আমাকে ভুলে যাবে নাতো?"

"ও কথা বলো না কুমারী, চন্দ্র-সূর্য যতদিন আছে তাওকি কখনও হয়?"

"খুব তাড়াতাড়ি না ফিরলে কিন্তু আমি আড়ি করব। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে, আমি প্রতীক্ষায় থাকব।"

কুমারীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে শঙ্কর তার কানে কানে বলে, "নিশ্চয়ই আসবো।"

তারপর আস্তে আস্তে অসীম সমুদ্রে তার নৌকো ভাসায়! যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ দেখে কুমারী শঙ্করকে আর শঙ্কর কুমারীকে। তারপর ফিরে আসে বাড়ীতে, প্রতীক্ষায় থাকে শঙ্করের। এক ঘণ্টা কেটে যায়—দু'ঘণ্টা কেটে যায়, দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি হয়—শঙ্কর ফেরে না। কুমারীর মা, বাবা বলে, "জ্যোৎস্না রাত, কোন ভয় নেই, হয়তো এখনও সাতটা ধরতে পারেনি। মাঝ রাতের আগেই ফিরবে।" কিন্তু অসহ্য এক অস্বস্তি কুমারীর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অন্নে তার রুচি হলো না। ঘুম তার চোখের পাতা থেকে বিদায় নিলো। পথ চেয়ে বসে থাকে। সামান্য শব্দে সচকিত হয়ে ভাবে ঐ বুঝি শঙ্কর এলো।

এমনি ভাবে রাতও কাটলো। তখন কুমারীর মা-বাবা ভীত হয়ে পড়লো। প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সমুদ্রতীরে তারা গেলো শঙ্করের খোঁজে। সকলে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আবার দুপুরের দিকে সবাই ফিরে আসে। শঙ্করের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। তার নৌকোরও কোন খোঁজ নেই! তারা সবাই বুঝে নেয় যে, শঙ্কর চিরকালের জন্য পাড়ি দিয়েছে। কুমারীর বুড়ো মা-বাবা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একজন বলে, "দুজনের লগ্নে হয়ত কোন গোলমাল ছিল। ভগবান হয়ত তাদের একসঙ্গে রাখতে নারাজ।"

অন্য এক আত্মীয় বলে, "দুজনে যেন হর-পার্বতীর মত জুটি ছিল।"

তৃতীয় আত্মীয় বলে, "ছেলেটি শিব তুল্য। নামে শঙ্কর কাজেও ভোলানাথ।"

কিন্তু কুমারীর চোখে একফোটা অশ্রু নেই। মুখে কোন সাড়াশব্দ নেই। বিষাদ ভরা চোখে ঠায় পথ চেয়ে থাকে কোন কথা বলে না, কাঁদে না, খায় না, ঘুম নেই তার চোখে। একে একে সব আত্মীয়-স্বজন ফিরে যায়।

গোধূলি-বেলা। কুমারী ভাত, সোম্বার, মাছ সব রান্না করে নিয়ে শেষ বারের মত যেখানে শঙ্করের সাথে দেখা হয়েছিলো সে দিকে চলে ধীর শান্ত গতিতে, যেন অভিসারে চলেছে সে। মর্মান্তিক অভিসার। মা-বাবাও তার পিছু ধরে। বোঝাতে চেষ্টা করে। রাত হয়, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তারা খুব জোর তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু সেই শেষ নয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার দিকে কুমারী ঠিক একই ভাবে ভাত, সোম্বার এবং তরকারী নিয়ে সমুদ্রতীরে যায়, অনেক রাতে বাড়ী ফেরে।

মা-বাবা বলে "মা, আর শঙ্করের খোঁজ করে লাভ নেই, সে এই পৃথিবীতে নেই।"

কুমারী জবাব দেয়, "না মা, শঙ্কর আছে। সে নিশ্চয় আসবে।"

"এমন করে ভেবে ভেবে তুই যে মা পাগল হয়ে যাবি।"

"না মা, আমি ঠিকই আছি। শঙ্কর নিশ্চয়ই ফিরবে! সে আমাকে কথা দিয়েছে। তোমরা আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করো না।"

"কিন্তু সেই তো তোকে ভুলে গেছে মা, তার কথা আর চিন্তা করা বৃথা।"

"না তা হতে পারে না। শঙ্কর আমাকে কখনই ভুলতে পারেনা। সে আমাকে কথা দিয়েছে ফুল দিয়ে আমাকে পূজো করবে। আর বলেছিল, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নিবিড় কালোছায়া আমাদের ভালবাসাও তাই।"

"মা আমার কথা শোন। এভাবে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করো না। তোমার জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধান আমরা করেছি।"

কুমারীর চোখে বেদনার বেগবতী নেমে আসে। ধীরে বিনয় মেশানো বলিষ্ঠকণ্ঠে সে বলে, "আমার কাছে শঙ্করের চেয়ে যোগ্যপাত্র আর কে আছে মা? শঙ্কর নিশ্চয় ফিরবে। আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনাদের একটুও চিন্তা করতে হবে না; আমাদের বিয়ে অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। আমি এ ভাবেই প্রতীক্ষায় থাকব। শেষ পর্যন্ত আমিও তার খোঁজে সমুদ্রে পাড়ি দেবো।"

মহাকালের পঞ্জিকায় অনেক পাতা উড়ে যায়। বহু বছর হয়ে যায় অতিক্রান্ত। কুমারীর মা-বাবাও একে একে বিদায় নেন পৃথিবী থেকে। তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল তাতেই কুমারীর চলে যায়। সে যথারীতি

প্রতিদিন নিজের এবং শঙ্করের জন্যে রান্না করে। শঙ্করের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জায়গায় তার খাবার নিয়ে যায়। এই ভাবেই তার জীবনের বহু, দিন মাস, বছর কেটে যায়। কুমারীর দেহের উপর নেমে আসে বাটটি বছরের বার্ধক্যের ভার। দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রতীক্ষা-জর্জর কুমারী একই দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী পালন করে আসছে।

অবশেষে একদিন কুমারী কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। প্রতিবেশী নায়ার পরিবারের বউ এসে তার পরিচর্যা করে। কুমারী তাকে মিনতি করে বলে,…"শঙ্কর অভুক্ত থেকে যাবে। তার জন্য আজকে আমি ভাত, সোম্বার নিয়ে যেতে পারিনি। তার ফেরার সময় হয়ে এসেছে, আজ তুমিই নিয়ে যাও।"

দ্বিতীয় দিন কুমারীর অসুখ আরও বাড়ে। তার পবিত্র চরিত্র, নির্মল প্রেম, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর অপূর্ব বিশ্বাসের কাছে গাঁয়ের সবাই শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

আরও দুদিন কেটে যায়। পাড়াপড়শীরা সবাই তার শয্যার পাশে জমা হয়। কুমারীর জ্ঞান প্রায় লোপ পেয়েছে। সেই আধো ঘুম, আধো জাগা অবস্থায় তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল,—"শঙ্কর, তুমি আমাকে ভুলে যেওনা। তুমি তাড়াতাড়ি না ফিরলে আমি বাঁচবো না শঙ্কর। শঙ্কর! তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই প্রতীক্ষারত অভাগিনীকে কোলে তুলে নাও।"

সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের সবাই কুমারীকে ঘিরে বসে। হঠাৎ তার চোখে মুখে দীর্ঘ দিনের তপস্যার সার্থকতায় আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠে। এক সময় থর থর কম্পিত দেহে আনন্দাশ্রু ঝলসিত চোখে সে সবেগে উঠে বসে। এগিয়ে যায় দুয়ারের দিকে, বাটটি গ্রীষ্মের তপ্ততায় ঝলসানো দুর্বল হাত প্রসারিত করে বলে—"ঐ যে আমার শঙ্কর। ঐতো আমাকে ডাকছে। শঙ্কর আমাকে ভোলেনি। শঙ্কর মিথ্যাবাদী নয়। শঙ্কর! শঙ্কর! তুমি আমাকে ডাকছ? আমিও আসব। নাও ধর, ধর আমার হাত। তোল আমাকে। চল।"—উত্তেজনায় সমস্তদেহ তার কম্পমান। দুরন্ত এক আবেগে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে পড়ে যায়। তার পরই সমস্ত নিথর, নিস্পন্দ! কুমারীর আশৈশব প্রেমের সেই শেষ বিজয়বাণীর অনুরণন সমস্ত পরিবেশটাকে অনন্ত এক

অনুভূতির করুণ অথচ আনন্দঘন বিশ্বজয়ী সুরের স্পর্শে ভাষাহীন বিহ্বলতায় ভরিয়ে তোলে।

তাঁরপর গাঁয়ের সবাই মিলে সারাটি জীবন ধরে কুমারী যেথানে শঙ্করের প্রতীক্ষা করে এসেছে সেইখানেই তার সমাধি রচনা করে। সে তো সমাধি নয়—প্রেমের দেউল। আজও সেখানে জলছে প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা। চিরন্তন প্রেমের প্রতীক কুমারী আজও কন্যা-কুমারী দেবী নামে পূজো পাচ্ছে।

শঙ্কর একদিন বলেছিল "ফুল দিয়ে তোমায় পূজো করবো। লোকে তোমার পূজো করবে।"

শঙ্করের সে কথা আজ সূর্যের মত সত্য।